যত্তে রূপং কল্যাণতমং
তত্তে পশ্যামি

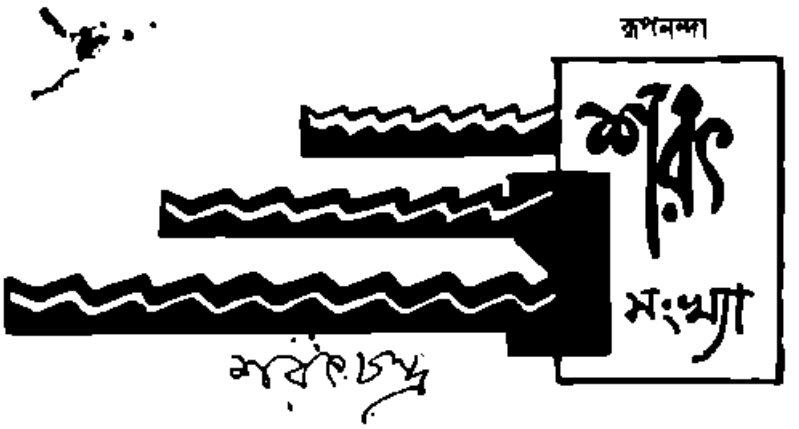

যাবার তরীর স্থান শ্রাবণের আসনে,
স্মৃতি তার স্মৃতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের হৃদয় থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি'॥

১৭ শ্রাবণ
১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্র

জন্ম ৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩

মৃত্যু ২রা মাঘ, ১৩৪৪

চৈত্রের চতুর্দ্দশীর দিবসকে বাঙালী কখনও ভুলিবে না। মাঘের শীত সেদিন অকস্মাৎ সংবরণ করিয়াছিল, না কি, বাধিতা বেলোর দীর্ঘশ্বাসে বাতাস সেদিন সত্যই আতপ্ত হইয়াছিল, কে জানে! কিন্তু ঠাণ্ডা সেদিন কম ছিল, এবং পূর্ণিমার রাত মাধবী জ্যোৎস্নায় বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

শ্মশানভূমি হইতে ফিরিবার পর মাঘের এই প্রথম পূর্ণিমা দিবসে মধ্যরাত্রি অবধি রূপনন্দা—

মাঘ ১৩৪৪

বারম্বার স্মরণ

ছিলাম আজ এই অবসরে তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে রূপনন্দার অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম।

সকল সুধী বন্ধুজন এই অর্ঘ্য সজ্জাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে প্রয়াস স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের চরণে শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নিগ্ধ শরৎচন্দ্রের স্বর্গীয় আত্মার আশীর্ব্বাদ উদ্দেশে প্রার্থক হইয়া উঠুক

—শরৎ সংখ্যা

তৃণ একুশ

আমাদের এইমাত্র অভিলাষ। আমাদের সমবেত নীরাজন জয়যুক্ত হউক ॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

শরৎচন্দ্রের চিতাভস্ম এখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে, এখনও শোকাঘাত হইতে বাংলার তরুণ সংঘ সম্পূর্ণ সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও পশ্চিম দিগন্তে অস্তরাগের মত তাঁহার জীবিত কালের স্মৃতি বাঙালীর মনের আকাশে লাগিয়া রহিয়াছে, সাহিত্য জগতে তাঁহার দানের হিসাব নিকাশ করিবার কথা এখন কল্পনা করা বাহুল্য। তাই এস্থলে সংক্ষেপে শুধু আলোচনা করিব, কী এমন তাঁহার দান যাহাতে তিনি "বাংলা সাহিত্যের সুমেরু শিখরে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতিভা জ্যোতি বিকীর্ণ ক'রলেন" (রবীন্দ্রনাথ)।

বঙ্কিম-প্রতিভা সম্বন্ধে একদা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র না কি ভারতীর কুঞ্জে একতারা বাজাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বীণার একটি একটি করিয়া বহুতার সংযুক্ত করিয়া বাজাইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সে বীণাকে তিনি সহস্র-তার বীণায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। সে দিক দিয়া শরৎচন্দ্র হয়ত বা সত্যই বাঙালীর আঙিনায় এক কোণে বসিয়া একতারাই বাজাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাজাইতে পারিলে যে একতারা বহুতার বীণাকেও মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে সময়ে সময়ে পরাস্ত করিতে পারে শরৎচন্দ্র শুধু তাহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

বাংলার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় অনেক দিনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আকস্মিক সূর্যোদয়ের মত। সূর্যোদয়ের ঘটনা কিছু কাহারও নিকট একটা অদৃষ্টপূর্ব বিস্ময়কর বস্তু নহে; তথাপি একথাও সত্য যে ক্রমাগত কিছুদিন ধরিয়া মেঘ করার পর যখন একসময় আকাশে সহসা সূর্য্য দেখা দেয় তখন নিম্নে ধরণীবক্ষে যেন একটা সাড়া পড়িয়া যায়, লোকসমাজে একটা পুলকচাঞ্চল্য স্পষ্ট লক্ষিত হয়। এই অতর্কিত চাঞ্চল্যের লহরী তুলিয়া শরৎচন্দ্র ভারতীর কুঞ্জ-তোরণ অতিক্রম করিয়া উন্নত মস্তকে ভিতরে প্রবেশ করেন। বাংলার একজন বিদগ্ধ অধ্যাপক সমালোচক এই প্রবেশের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "Never in the field of Bengali literature did the emergence of an original genius create a greater stir".

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব অতর্কিত নহে। বোধ করি ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই তিনি ঘন ঘন বাণীকুঞ্জশিরোনামার পত্র প্রেরণ করিতেছেন, তিনি আসিতেছেন। তাই ভারতীর নিকুঞ্জ-দ্বারে তিনি যখন আসিলেন তখন যে শুধু দ্বারী তাঁহাকে সসম্ভ্রমে করিয়া পথ ছাড়িয়াছিল তাহাই নয়, বরঞ্চ বাহিনীর আসন্নাট্, সমস্ত সেবক তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসিয়াছিলেন। সেদিক দিয়া শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় প্রকৃতই অতর্কিত। সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত, হয়ত,

—রূপনন্দা
মাঘ ১৩৪৪

বা প্রাথমিক কুণ্ঠার সহিতই, তিনি বীণা-পাণির কুলদ্বারে অতি ধীরে নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে অতিক্রম করেন; যারী তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই, প্রবেশপথে তীক্ষ্ণ করিয়া কেহ তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতেও আসেন নাই; বা ভিতরের জনতাও তাঁহার আবির্ভাবে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি তাঁহার বসনান্তরপ্রচ্ছন্ন প্রথম রক্তপদ্মখানি দেবী ভারতীর রক্তিমপদপল্লবতলে নিবেদন করিয়াছেন সেই মুহূর্তে আর কেহ তাঁহাকে না দেখিবার ভাণ করিতে পারেন নাই, দেবী-মন্দিরের বাদকদল আকস্মিক উত্তেজনায় দুন্দুভি-মন্দিরায়, কাড়ানাকাড়ায়, অরঝনি-তরঙ্গ তুলিয়াছে, বিক্ষুব্ধ জনতা প্রশ্নাবিস্ময়-জড়িত নত মস্তকে তাঁহাকে উচ্চাসন দিয়াছে, অন্তরীক্ষ হইতে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে বাংলার সাহিত্য-কুঞ্জ-পরিধির অন্তরালে যে চঞ্চলতা উঠিয়াছিল তাহার তরঙ্গ সমুদ্রপারে গিয়া রবীন্দ্রনাথের মত দূরস্থ বা দেশবীপবাসীকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই, কিন্তু বিক্ষোভ যে সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত ইওরোপ ও আমেরিকার গভীর উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যাহা আজও থামে নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহারই পাশে, তাঁহার অতি প্রখর উজ্জ্বলতার মধ্যেও যে আর একটি জ্যোতিষ্ককে লোকে গভীর কৌতূহল ও বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়া

ছিল তাহা কম গৌরবের কথা নয়। এমন কি বিলাতে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় শরৎ-প্রসঙ্গে এমন একটা কথাও বলা হইয়াছিল যে, "……And even in the original Tagore is not at his best in his short stories"—এবং সেখানে শরৎচন্দ্রকেই বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বিলাতের পত্রিকার সমালোচক লেখেন, "There has, however, recently arisen a young Bengali writer of stories for whom we may with some confidence already claim parity with Guy de Maupassant……His knowledge of the ways and thoughts and language of women and children, his power of transferring those vividly to the printed page, are such as are rare indeed in any country."

বিলাতের পত্রিকা শরৎচন্দ্রকে বাংলার মোপাসাঁ বলিয়াছে। একদিক দিয়া সে কথা সত্য। কারণ, তিনিও মোপাসাঁর মত বাঙ্গলীর সমাজের প্রত্যেক গৃহকোণে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমাদের দেশের সমালোচক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"……His bold heterodoxy, his scathing criticism of accepted values and current standards, his championship of forbidden aspects of love which lay

—শরৎ সংখ্যা
ছয় তেইশ

so long under a social ban—all created an uproar, the like of which had never been witnessed in the still and placid atmosphere of Bengali literature." মোপাসাঁ সম্বন্ধে এই উক্তির প্রত্যেকটি কথাই সত্য তাই শরৎচন্দ্রকে মোপাসাঁর সহিত তুলনা করা কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রকে কেবলমাত্র বাংলার মোপাসাঁ বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। টল্‌ষ্টয়ের ন্যায় মত রহিয়াছে তাঁহার কিরণময়ী, টুর্গেনিভের ইন্‌সারভের মত রহিয়াছে তাঁহার সব্যসাচী, ধর্ম্মব্যবসায়ী ভণ্ডের প্রতি তাঁহার তীব্র বিদ্রূপ ও আক্রমণ রহিয়াছে আনাতোল ফ্রাঁস অথবা সিন্‌ক্লেয়ার লুইস অথবা বার্ণাড শ'র মত; কিন্তু এ'সমস্তকেও অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে তাঁহার অন্নদাদিদি, তাঁহার সুনন্দা, তাঁহার রমা, অ্যাঠাইমা, তাঁহার জ্ঞানদা, আরও কত যাহারা কেবল মাত্র বাংলার, যাহারা কেবলমাত্র বাঙালীর। বিশ্বসাহিত্যের দরবারে শরৎচন্দ্রের স্থান ঠিক কিরূপ তাহা আলোচনা করিবার স্থান ও কাল এ নয়, কিন্তু আমিও বলি সেখানে তাঁহার যত উর্দ্ধেই স্থান হউক না কেন, বাঙালীর অন্তরে তাঁহার যে স্থান তাহা অপেক্ষা গৌরবময় আসন তিনিও যেমন চান নাই, আমাদেরও তেমনি তাহার অঙ্ক চিহ্নিত হওয়া স্বাভাবিক নয়।

বিশেষ করিয়া বাংলার অন্তঃপুর যেমন করিয়া শরৎচন্দ্রের লেখনী নিঃসৃত করুণা মিশ্রিত সমবেদনা ও প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে তেমনটি আর কোনও শিল্পীর নিকট হইতে এ যাবৎ বাঙলা সাহিত্যে মিলে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন নায়িকাই তাঁহার কল্পনাবিলাসের হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আর সমাজ-বিদ্রোহিণী রমণীকে স্নেহ-প্রশ্রয় দিতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সূর্য্যমুখী অথবা ভ্রমরকে স্বামীর অপরাধের বিরুদ্ধে ঠিক বিদ্রোহিণী বলা যায় না—তাহারা কতকটা যেন অতি অভিমানিনী। তা'ও হতভাগিনী অভিমানিনীদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষপরায়ণ লেখনীমুখে খুব একটা উদার প্রশ্রয় মিলে না, মনে হয়, সত্যের উপাসক একজন মহাবিচারকের হাতে চরিত্রগুলি পড়িয়াছে, স্নেহদুর্বল জনকের হৃদয়, প্রীতিপ্রবণ ভ্রাতৃহৃদয় অথবা বন্ধুর উদার সৌহার্দ্য লইয়া কেহ তাহাদের কথা ভাবে নাই। বাংলার অদ্বিতীয় সমালোচক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"The heroines of Bankimchandra notwithstanding all their charm and grace can hardly claim to represent the feminine point of view; they are quite happy in their old, traditional niches and an occasional chafing against minor oppressions is never fanned in them into the flame of revolt" আমিও বলি fanned হওয়া দূরের কথা কদাচ প্রশ্রয়ও পায় নাই।

এইখানে শরৎচন্দ্রের সহিত অন্যান্য বহু মনীষীর পার্থক্য। বিদ্রোহিণী তাঁহার

—রূপনন্দা

কাছে প্রশ্রয় পাইয়াছে, আর অপরাধিনী তাঁহার গভীর করুণা পাইয়াছে। অপরাধিনীকে বিচার করিয়া শাস্তি না দিয়া সমবেদনা জানানো হয়ত বা মহৎলোকের কাজ নয়, কিন্তু মহাপ্রাণ লোকের কাজ। সেদিক দিয়া শরৎচন্দ্র মহতের তালিকা হইতে নিজের নাম ঘুচে রাখিতে কিছু মাত্র দ্বিধা করেন নাই। বাংলা সাহিত্যে অতি বড় অপরাধিনীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশে প্রথম অগ্রণী হন রবীন্দ্রনাথ, দৃষ্টান্ত তাঁহার চতুরঙ্গএর নবীবালা। কিন্তু চন্দ্রমুখীর প্রতি শরৎচন্দ্রের যে করুণা তাহা রবীন্দ্রনাথেও নাই। "স্ত্রীর পত্রে" বিদ্রোহিনী স্ত্রীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রশ্রয় পাঠকের মনকে অতি সহজে স্পর্শ করে কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন অভয়াকে প্রশ্রয় দেন তখন প্রথমটা ইহার অসাধারণত্ব আমাদিগকে একেবারে হতবুদ্ধি করিয়া দেয়। মনে হয় ইহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু প্রস্তুত না থাকিলেও গ্রহণ করিতে হয় পৃথিবীতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আইনষ্টাইনের তথ্যের জন্যও'ত প্রস্তুত ছিলাম না;—কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্য অথবা প্রস্থ পূর্ব পশ্চিমে ধরিলে একপ্রকার হয় ও উত্তর দক্ষিণে ধরিলে আর একপ্রকার হইতে পারে এবিধানও কেহ করিতে পারে! বিশ্বের যখন চোখ দিয়া দেখিবার মত ও সাধারণ জ্ঞান দিয়া বুঝিবার মত কোনও প্রমাণই নাই। তথাপি ইহা সত্য। শরৎচন্দ্রের অভয়া একটা সমস্যা উত্থাপন করিয়াছে মাত্র। সে সমস্যাকে এড়ানো সহজ নয়। দীপের সহিত ছায়ার মত তাহা অবশ্যম্ভাবী।

শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহিনী অভয়া, কমল আমাদের আজন্ম সংস্কারের মূলে অতি তীব্র ঘা লাগাইয়াছেন তাই তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে কষ্ট হয়। ইবসেনের গোস্টস্‌ও সমগ্র ইওরোপের সংস্কারমূলে আঘাত দিয়াছিল। তাই সেণ্ট্‌সবেরীর মত পণ্ডিতও তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই; বলিয়াছিলেন—"The doctrine of heredity has been brought in a very clumsy manner—ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু সেণ্টসবেরীর মহা পাণ্ডিত্যকে উপহাস করিয়া গোস্টস্‌ বিশ্ব-সাহিত্যে অপরূপ সৃষ্টি হইয়া রহিয়া গেল।

আর একধরণের তারী অদ্ভুত শ্রেণীর বিদ্রোহিনী শরৎচন্দ্রের নিকট অতিরিক্ত প্রশ্রয় পাইয়াছেন; তাহারা অন্নদা দিদি ও সুনন্দা। এ দুটি চরিত্র শরৎচন্দ্রের কল্পনা-বৃক্ষের উত্তুঙ্গ শাখার দুটী ফল, সদ্যো-বিকশিত পুষ্পের ভ্রমরচিত্তহর সৌরভ ইহাদের নয়, সম্পূর্ণ ফলের পরিপক্কতার পরিণতির পরিমলে ইহারা বাংলার সাহিত্য-কুঞ্জকে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এ' সৃষ্টি শুধু শরৎচন্দ্রেই সম্ভবে।

এ' পর্য্যন্ত যত চরিত্রের উল্লেখ করিলাম সমস্তগুলির মধ্যেই কিছু না কিছু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আছেই, এবং তাহারা সকলেই অন্তর্বিস্তর আপন শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু নিঃসহায় সকলের পশ্চাতে সমাজ-সপ্তরথী-পরিবেষ্টিতা যে নারী-

—শরৎ সংখ্যা

অভিনন্দন। শরৎচন্দ্রের উদার লেখনী-মুখের অমৃত কণা লাভ করিয়াছে তাহারা তাঁহাকে বাংলার অন্তঃপুরের নিত্যপূজ্য দেব-পর্যায়ে তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহার অনুরাধা, তাঁহার মৃণাল, তাঁহার বামুনী, ইরা, তাঁহার জ্ঞানদা, ইহারা যত কাল আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উঠিবে ততকাল বাংলার এই দিক্‌পাল মনীষীকে নিভৃতে কৃতজ্ঞতার পুষ্পোপচার নিবেদন করিবে।

এবার শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলির বাস্তবতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। একদা আমার এক বন্ধু বলিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখী অত্যন্ত অবাস্তব, পৃথিবীতে পতিতা-শ্রেণীতে অনুরূপ নারী মিলে না। কিন্তু প্রশ্ন তাহা নয়। সমস্যা হইতেছে যদি মিলে, যদি কখনও বাঙালীর সমাজতোরণে আসিয়া চন্দ্রমুখী করাঘাত করে তখন কী হইবে? তখন কী বাঙালী তাহাকে দ্বার-উদ্‌ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিবে? রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তর দেহাতীত সম্বন্ধে সমাজ কী বলিবে, যদি অমনি কোনও দ্বৈতজীবন সমাজের দাবী জানায়, তখন, তখন বাঙালী কি ভাবে সে সমস্যার সমাধান করিবে? শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক গল্পই এক একটি প্রশ্ন, কোনও প্রশ্ন প্রথম, কোনটি বা অন্য কোনও স্তরের এবং একটি মাত্র শেষের।.....জানি কমলকে আমরা কোনও মতে সহ্য করিতে পারি না; কিন্তু 'গোরা'র তর্ক শুনিয়া 'সুচরিতা' যেমন ভাবিত, এমন কেহ নাই যে ইহাকে তর্কে পরাস্ত করিয়া একেবারে শুদ্ধ করিয়া দেয়, আমরাও তেমনি করিয়া ভাবি কমলকে কেহ শাণিত যুক্তি দিয়া নির্বাক করিয়া দিক। কমলের প্রতি শ্রদ্ধা সহানুভূতি হয় কি না জানি না, কিন্তু অধ্যাপক অক্ষয়ের প্রতি যে হয় না তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং স্রষ্টার স্রোত এইখানে।

বাংলা সাহিত্যে লেখক শরৎচন্দ্রের যেমন একটি বিশেষ স্থান রহিল, বাঙালীর মনে মানুষ শরৎচন্দ্রেরও তেমনি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা থাকিল। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে কবি ও কাব্য মিলে না। শেলী, কীট্‌স, বাইরনের কবি সত্তা খেলিয়া অধিকতর তাহার আসর জমাইয়া গিয়াছেন, 'লরেন্স-হলে'র স্রষ্টা কোনও দিন দেশবাসীর দুঃখের অংশীদার হইতে পারেন নাই, টলস্টয়ের জীবনী লেখনীতে বিরোধ ছিল। শরৎচন্দ্রের জীবনে এই বিরোধ শূন্যের পর্য্যায়ে দেখা গিয়াছে। তাঁহার লেখনী তাঁহার জীবনীর সহিত সমান তালে চলিয়াছে। অন্তরের অনুভূতি ও জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আর এ কথা মানিতেই হইবে যে অভিজ্ঞতা না থাকিলে সাহিত্য হয় না, কবিত্ব হয়। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা সকলেই জানেন যে বাংলার মানুষের প্রতি তাঁহার যে দরদ তাহা শুধু তাঁহার কথায় এবং লেখায় ছিল না, তাঁহার জীবনের বহু কর্মের মধ্যেও তাহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

সমস্ত জীবন তিনি নীরবে নিভৃতে আপন সাধন-মন্দিরে কাটাইয়া গিয়াছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ দিনগুলি প্রভাতের মুখে এক একটি পদ্মপত্রের মত ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। লোকসমাজে আসিয়া আপনাকে নিখিলের দৃষ্টি-গোচর করিবার প্রয়াস তিনি জীবনে করেন নাই। চতুর্দিকস্থ কোলাহলের মধ্যে তাঁহার নির্মল উদাস, তাঁহার কঠোর নৈঃসঙ্গ্যই তাঁহাকে সকল দৃষ্টি সমুখে মহত্তর করিয়া তুলে। আপনাকে প্রকাশ করা বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য সংযম দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই বাংলায় এমন মানুষ নাই। তাই শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে আজ একটা কথা বার বার মনে হইতেছে—

"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহান্।"

সতর্ক এবং অভিজ্ঞ লোকদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা চক্ষুর নিমিষে কোন দ্রব্যের দোষগুণ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে না—সবটুকুর বিচার না করিয়া সবটুকু ধারণা করিয়া লয় না। কিন্তু আর এক রকমের লোক আছে, যাহারা ঠিক উহার উল্টা। কোন জিনিষ বেশীক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিবার ধৈর্য্য ইহাদের নাই। কোন কিছু হাতে পড়িবামাত্র স্থির করিয়া ফেলে ভাল কিংবা মন্দ, তলাইয়া দেখিবার পরিশ্রমটুকু ইহারা বিশ্বাসের জোরে চালাইয়া লয়। এ সকল লোক যে জগতে কাজ করিতে পারে না তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক সময়ে বেশী কাজ করে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে ইহাদিগকে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে দেখিতে পাওয়া যায়। আর না হইলে অবনতির গভীর কন্দরে চিরদিনের জন্য শুইয়া পড়ে।——দেবদাস

রূপনন্দা—
মাঘ ১৩৪৪

—শরৎ সংখ্যা
দুশ সাতাশ

বছর বছর আসিবে ভাদর

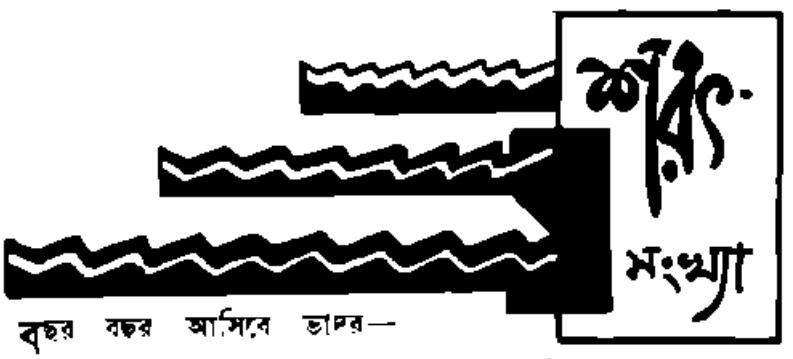

বছর বছর আসিবে ভাদর—
একদিন আসিব না—
বলেছিলে তুমি তবু এত আগে কেহ তবু জানিত না।
মরমী হে মিতা বেদনার চিতা হাজারো জ্বালিয়া গেলে—
সকলের আঁখি জল ছল ছল দেখিবে কে আঁখি মেলে?
মধুর ধরণী আজো সেই আছে তুমিই কেবলি নাই—
অগণিত প্রাণ কাঙাল আতুর কার বুকে পাবে ঠাঁই?
চির বঞ্চিত মানবের লাগি তোমার কোমল প্রাণ
ব্যাকুলি উঠিল কণ্ঠে তোমার সর্বহারাদের গান।
অসহায় প্রাণ "দেবদাস" লাগি কত প্রাণ কাঁদিয়াছে—
সাথে দেখি তার স্রষ্টারে ভালো সারাদেশ বাসিয়াছে।

শরৎ সংখ্যা— —রূপনন্দা

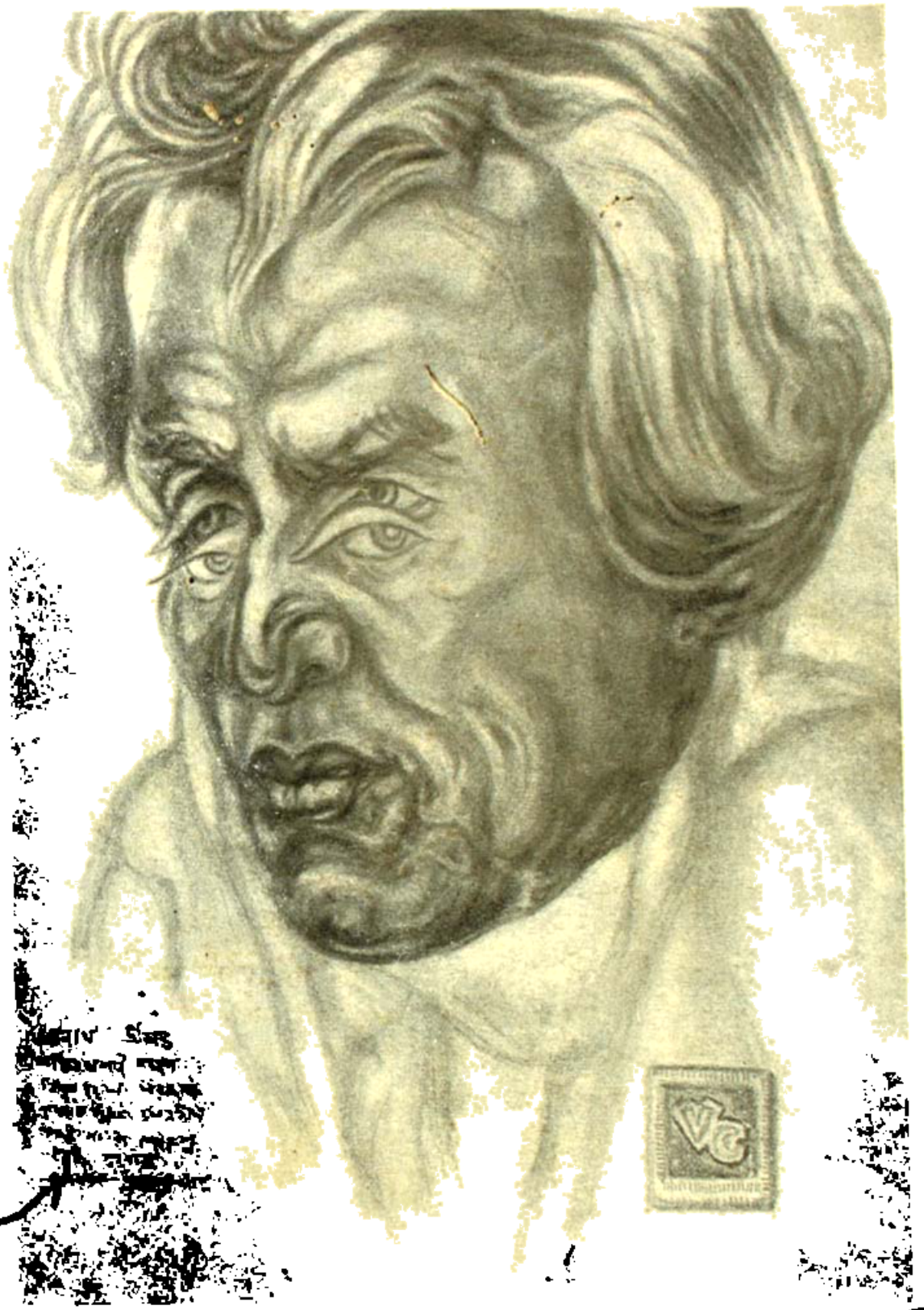

শতবর্ষ পরে শরৎচন্দ্র

শিল্পী—শ্রী ভোলা চট্টোপাধ্যায়

সীতা সাবিত্রী যষ্ঠীদের কথা পড়িয়াছি রামায়ণে—
রচিয়াছ তুমি নব "সাবিত্রী" মানুষের মনে মনে।
তুচ্ছেছ প্রশ্ন নাই সমাধান হে নবীন ভগীরথ—
সমাজ শাসনে ভ্রূকুটি হানিয়া নূতন করিলে পথ।
সোনার শরৎ প্রাণের শরৎ সবার শরৎ চাঁদ—
আপন স্বরূপে উজলিলে দেশ—মানে কি আঁখির বাঁধ?
জীবনের বেদ সফল করিল গৌরবময়ী "রমা"
পল্লীর বুকে যেন অপরূপ নবরূপে অনুপমা।

মায়ের রূপের সজীব মাধুরী দেখিয়াছি পোড়াকাঠে—
নারীরে দিয়াছ মা'র গৌরব তাহার জীবন নাটে।
মানব মনের ওগো যাদুকর শুধু লেখ নাই কথা—
সারা নিখিলের প্রাণেরে দিয়াছ অমূল্যতা।

"দেওঘর" হ'তে ফিরিবার পথে সেদিনও "বর্দ্ধমানে"—
হাসির লহর তুলিয়া ডাকিলে মরমের মাঝখানে।
অতুলন স্নেহ প্রাণভরা হাসি সেই স্বর মধুময়—
পাব না ভুবনে মমতার সনে নিতি নব পরিচয়।

আর যাইবে না পল্লী-দুলাল রূপনারায়ণের ধারে—
"সামতাবেড়" যে ভরিয়া উঠিল বেদনার হাহাকারে।
তুমি ছিলে দেশ নীরব সেবক লেখনী চাবুক দিয়া—
নূতন করিয়া গড়েছ স্বদেশ—নিপীড়িত প্রাণ নিয়া।
পঙ্কের মাঝে ফুটালে কমল হে নব শক্তিধর—
আজি অমরায় তুলিলে ধরায় তুলিলে স্বজন ঘর।
কোথা তুমি দেশ-দরদী মরণে হ'লে আজ বরণীয়—
রেখে গেলে সারা বঙ্গের ঘরে নব নব আত্মীয়।

এপার হইতে শ্রদ্ধার স্মরণে দেখিনু উজল ছবি—
সকলের সাথে মহাপ্রাণ লাগি প্রণাম জানালো কবি।

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমাদের শরৎচন্দ্র

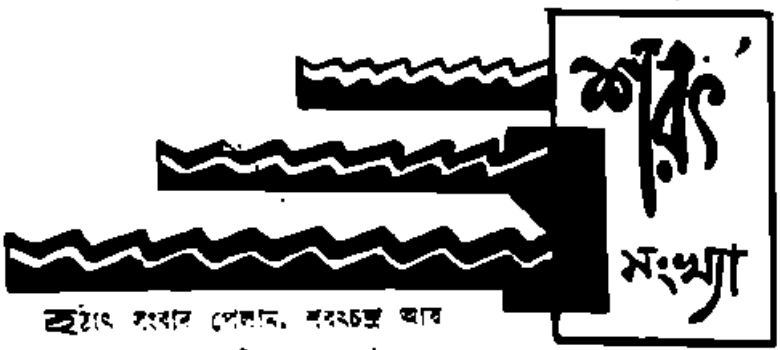

হঠাৎ সংবাদ পেলাম, শরৎচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। জীবনের কঠোরতম বাস্তবতার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে অন্তর যখন ধৎপরোনাস্তি বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে, তবু সেই রুক্ষ-মরুর বুকে এ সংবাদে যে তপ্তশ্বাস উঠলো, কান্নার চেয়ে তা কম করুণ নয়।

বহুদূরে পিছনে-ফেলে-আসা অতীত দিনগুলির কথা মনে পড়ছে আজ। পাঠ্য-পুস্তকের ফাঁকে ফাঁকে "যমুনা"র গল্পগুলি কী আগ্রহের সঙ্গেই না পড়তাম। সেই 'যমুনা'র পৃষ্ঠাতেই এক অখ্যাতনামা লোকের লেখা "রামের সুমতি" পড়ে বিস্ময়ে আনন্দে একেবারে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আশৈশব যা-হারা মনের সমস্ত আকুলতা নিয়ে রাম আর নারায়ণীর অপূর্ব্ব স্নেহের কাহিনীটীকে শুধু পড়েছিলুম বললে বোধ হয় ভুলই হবে, অন্তরের নিভৃততম গুহায়-গুহায় তার বেদনায়-মেশা আনন্দটুকু সেদিন যেমন করে সেঁধে গিয়েছিল, আজও তা তেম্‌নি সজীব হয়ে আছে। তারপর থেকে সেই অখ্যাত-লেখকটীর নাম ঘরে-ঘরে প্রতিমাসে 'যমুনার' পাতা উল্টে দেখেছি। বঙ্কিমও হতে হয়নি। একে-একে পেলাম, "বিন্দুর ছেলে" "পথ-নির্দ্দেশ", "চন্দ্রনাথ।"

সেদিন সেই অখ্যাতনামা লেখকটীই কেমন করে আমার মত বাঙ্গালার অসংখ্য নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে যশের উর্দ্ধতম শিখরে উঠে দাঁড়ালেন, স্তিমিত বিস্ময়ে তা লক্ষ্য করেছি। মনে পড়ে, যমুনার পাতায় অর্দ্ধসমাপ্ত "চরিত্রহীন" হঠাৎ থেমে পড়ার পর "ভারতবর্ষে"র বিজ্ঞাপনপৃষ্ঠায় "চরিত্রহীন" শীঘ্রই বইয়ের আকারে বাহির হচ্ছে দেখে কতদিন কলেজ থেকে ফেরবার পথে "ভারতবর্ষ" আফিসে খোঁজ নিয়েছি, 'চরিত্রহীন' কবে বেরুবে—এখনো কেন বেরুলো না? ইত্যাদি। এবং এও মনে পড়ে, প্রকাশক একদিন অসহিষ্ণু হ'য়ে জবাব দিয়েছিলেন,—কৈফিয়তের ঠেলায় আমি অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লুম যে মশাই। "চরিত্রহীন" এখনো লেখাই শেষ হয়নি, তা আমরা কি করবো?

মনে মনে যদিও হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, তবু এটুকু বুঝেছিলাম, চরিত্রহীন

—অপনন্দা

শরৎ সংখ্যা—
৬ষ্ঠ ত্রিশ

মাঘ ১৩৪৪

সত্যিই একটা বিস্ময়কর বস্তু হয়েই আত্ম-প্রকাশ করবে।

আজ যখনই ভাবি, শরৎচন্দ্র কি ছিলেন আর কি হয়েছিলেন, তখনই মনে হয়, এই তো সত্যিকার বড় হওয়া। কোনো দরদী সুহৃৎকে তাঁর জন্যে দল পাকিয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়াতে হয়নি। তিনি বড় হয়েছিলেন নিজের জোরে, শুধু তাঁর অমর লেখনীর জোরে। কুজ্ঝটিকা যত দিগন্ত-ব্যাপীই হোক্ না কেন, সূর্য্য যখন ওঠেন তাঁর সপ্তাশ্বের রশ্মি ধরে, তখন কুজ্ঝটিকা ভেদ করতে তাঁর এতটুকু বিলম্ব লাগে না। শরৎচন্দ্রের যশস্বী হবার পথে কোনো বাধাই তাঁর গতিরোধ করতে পারেনি।

আর, এই বিপুল যশকে তিনি অর্জ্জন করেছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন বাঙ্গলার সাহিত্য-আসরের মহামানব সাহিত্যের সবটুকু আসরই প্রায় দখল করে বসেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে যখন বাঙ্গালার পাঠক এতটুকু খাটো করে দেখতে পারছে না, সেই সময়েও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তাঁর আকস্মিক অভ্যুদয়ে তাঁর নিজের আসনখানি অনায়াসে দখল করে বসলেন। এই তো সত্যিকার বড় হওয়া।

এ কথাটা যখনই মনে পড়ে, তখনই লজ্জার সীমা থাকে না আমাদের আজকের সাহিত্য-আসরের পানে চেয়ে। যশের দেবতা আজ দুর্ভাগা সাহিত্যিকদের কাছ থেকে যতদূরে সরে আসেন, তাঁকে খাঁকুড়ে ধরবার জন্যে তত নির্লজ্জ কাড়া-কাড়িই তাঁরা করেন! আজ কেবলই চোখে পড়ে, সাহিত্যিকদের মধ্যে দলাদলির বহর। যেচারা যশ-কাঙ্গাল সাহিত্যিক আজ কেবলই এমন একটা দল খুঁজে বেড়াচ্ছে, যেখানে তার জন্যে অন্ততঃ একটুখানিও ঢাক পেটাবার ব্যবস্থা হতে পারে। আজ তাই সত্যিকার সাহিত্যের চেয়ে ব্যবসাদারী সাহিত্যের কদর বেড়ে চলেছে।

থাক্, ও-সব হয়তো অবান্তর কথা।

শরৎচন্দ্রের ইহজীবনের যবনিকা পড়ে গেল, রইল তাঁর লেখা। তাঁর লেখার বহু স্তুতিও হয়েছে। আবার নিন্দাও হয়েছে; প্যারডিও হয়েছে; অতি নির্লজ্জ গালাগালিও হয়েছে। সবই হয়েছে; হয়নি শুধু যা হওয়া উচিত ছিল, তাঁর লেখার সমালোচনা। সত্যিকার দরদ দিয়ে সমালোচনা করবার, দোষ ত্রুটী এবং গুণ, সব জিনিষের বিশদভাবে আলোচনা করবার লোকের অভাব আমাদের কতদিন থাকবে কে জানে। হয়তো একদিন আসবে, যেদিন শরৎচন্দ্রের লেখার সত্যিকার সমালোচনা হবে, যেদিন যোগ্য মণিকারের হাতে পড়ে তাঁর লেখা আরও ভাস্বর, আরও মহিমা-ময় হয়ে উঠবে।

কিন্তু, সে সময় আজ আসেনি। কবে আসবে এবং কোনোদিন আসবে কিনা তাই বা কে জানে! কেন না, আমরা বাঙ্গালীরা হৈ হৈ করে যেমন একজনকে তুলতে জানি, তেমনি হৈ হৈ করে তাকে ভুলতেও জানি। কে বলতে পারে,

—শরৎ সংখ্যা

বাঙলাকে—তথা বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে শরৎচন্দ্রের স্থান কোথায় এবং আদৌ কোনো স্থান আছে কিনা তা বিচার করবার মত ধৈর্য্য, অবসর এবং একাগ্রতা আমাদের কোনদিন হবে কিনা! কে বলতে পারে, আজকের এই দেশব্যাপী বিপুল শোকোচ্ছ্বাসের রেশটুকু বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই আমরা আমাদের শরৎচন্দ্রকে মন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলবো না?

যত দুঃখেই বলতে হোলো এ-সব, কেন না, বাঙ্গালার সাহিত্য আজ যত বড়ই হোক্, বাঙ্গালী আজও সাহিত্যকে সত্যিকার ভালবাসতে শেখেনি, সাহিত্যকে উচ্চাসনে বসাতে মনের কুণ্ঠা তার আজও যায় নি।

তাই আজ মনে হয়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে সেই দিনই আমরা সত্যিকার ভালবাসতে পারবো, যেদিন তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় যে লেখাগুলিকে তিনি আমাদের জন্যে পিছনে রেখে গেছেন, সেই লেখাগুলিকে আমরা আদর করে ঘরে তুলে নিয়ে সত্যিকার দরদ দিয়ে বিচার করতে পারবো। এইটুকুই তিনি আমাদের কাছে চেয়েছেন, আর কিছু না।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

যাহারা এতই সঙ্কীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেই জানে না, শিক্ষার অভাবে তাহারা এমনি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বল সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া ওঠে, তাহাদের উপর অভিমান করিবার মত ভ্রম আরও কিছু হইতে পারে না।—পল্লীসমাজ

শরৎ সংখ্যা—
মূল বত্রিশ

—রূপনন্দা
মাঘ ১৩৪৪

শরৎচন্দ্র ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

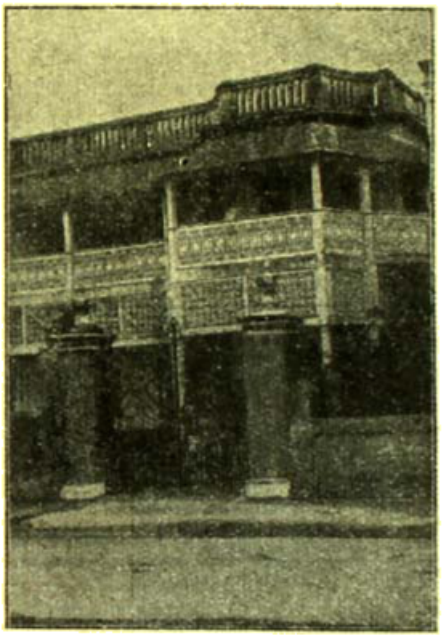

শরৎচন্দ্রের কলিকাতার বাটী

পানিত্রাসে শরৎচন্দ্রের বাটী

রবিবাসরে শরৎচন্দ্র

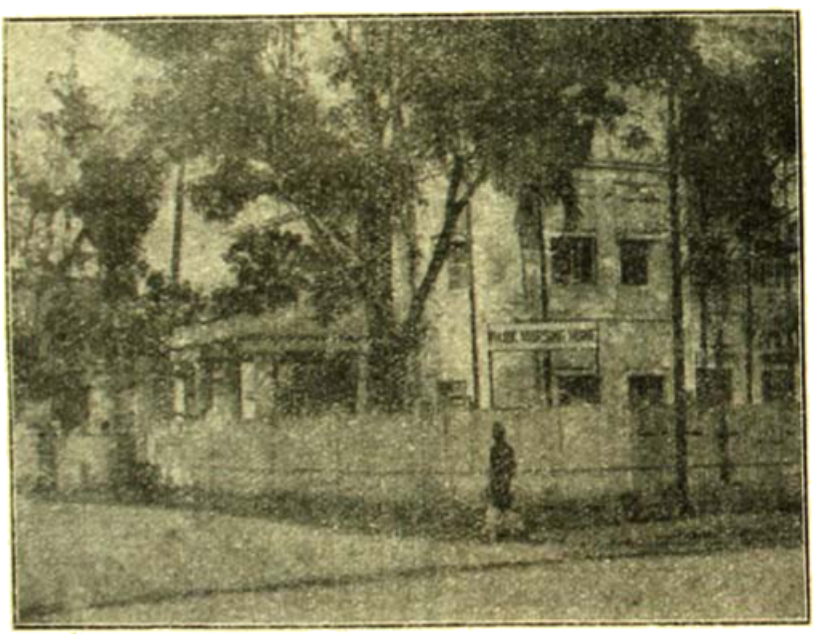

এই নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

পল্লীর শরৎচন্দ্র

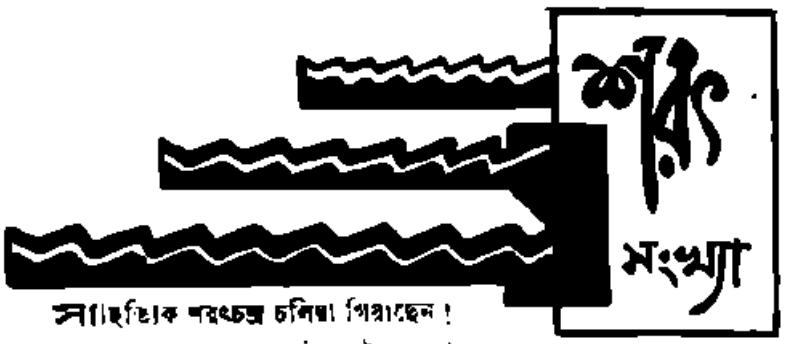

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন! নানাস্থানে শোক সভার অনুষ্ঠান হইতেছে। চারিদিকেই কেবল নাই নাই ধ্বনি! তবে কি তিনি সত্যই নাই? না—আছেন, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র মরেন নাই, তিনি অমর। যিনি গিয়াছেন, তিনি আমাদের পল্লীর শরৎচন্দ্র, গ্রামের মানুষ শরৎচন্দ্র। সকলেই দলে দলে নানাস্থলে শোক-সভা করিয়া তাহার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন। কেবল যাহাদের ভাষা নাই, শক্তি নাই তাহাদের ক্ষুব্ধ বেদনা অন্তরের মধ্যেই ব্যর্থ আর্তনাদ করিতেছে।

শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গুণগ্রাহী, দরদী, বিদ্বান ও বিদুষী অনেক কথাই লিখিতেছেন ও লিখিবেন; সে সম্বন্ধে লেখা ও আলোচনা করার অধিকার হয়ত আমার নাই, কিন্তু দীর্ঘ আঠারো বৎসর তাঁহার সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশার ফলে কত ঘটনা ও কত কথা যে মনের মধ্যে উদয় হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সব কথা লিখিবার শক্তি বা সময়ও আমার নাই। প্রাণের স্বপনসখা—

মাঘ ১৩৪৩

সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিবার চেষ্টা করিব।

গ্রামের প্রতি তাঁহার যে কী মমতা ছিল তাহা হয়তো কেহ কেহ জানেন। শিবপুরে যখন তাঁহার বাসা ছিল সেই সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার দিদি (অনিলাবালা) ও মুখুয্যে মশাইকে (৺পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়) দেখিতে আসিতেন ও কিছুদিন থাকিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন। পঞ্চু বাবু আমার আত্মীয়, আমি তাঁহাকে দাদা বলিতাম, সেই সম্পর্কে শরৎবাবুকেও দাদা বলিতাম।

একদিন শরৎ বাবু আমাকে বলিলেন, "সতীশ, যদি আমি তোমাদের পড়শী হই ও এখানে বাস করি তা হলে কেমন হয়?" আমি বলিলাম "যা হবেনা তার জন্য উত্তর দিয়ে লাভ কি দাদা! আপনি সহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে কারা খাঁটতে আসবেন, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন পরে বলিলেন, "না হে, আমি সত্যই বলছি আমি এখানে বাস করব, এই নদীটাই (রূপনারায়ণ) আমাকে

—শরৎ সংখ্যা

আরই করেছে। প্রাবটাদ স্বাস্থ্যও ভাল দেবানন্দপুরে আমি থাকবো না। সহর টহর আমার মোটেই ভাল লাগে না, সেখানে আমি হাঁপিয়ে উঠি"। আমি বল্লাম "কোন জায়গাটা আপনি পছন্দ করেন"? "কেন?" ইঁটোবাড়ির ডাঙ্গার পাশে নদীর ধারে"।

"ও জায়গা তো নদীতে পড়ে যাবে দাদা, তখন রক্ষা করবেন্ কি করে"?

"না না, এ পন্না নয় এর দরামায়া আছে, শুধু আমার বাড়ী কেন—আমার পাড়ার সকলের বাড়ী রক্ষা করে দেব; আর এ গরীবগুলোকে গৃহহীন হতে দেব না"।

তারপর পদ্মলার উদ্যোগে তাঁহার সাধতাবেড়ের গৃহাদি নির্ম্মাণ হইয়া গেল। বাসগৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা তিনি বেশী খরচ করিলেন নদীর কিনারা বাঁধিতে। আজিও "সাধতাবেড়" তাঁহারই অনুগ্রহে নদীগর্ভে নামিয়া যায় নাই। কিন্তু এবার যে কি হইবে, কে ইট্, পাথর দিয়া তাহার মেরামত করিবে, এই দুরবস্থার দিন তাঁহার দরিদ্র নিরক্ষর প্রতিবেশীগণ এখনও ভাবিবার অবসর পায় নাই।

তিনি ছিলেন গরীবের অবলম্বন, অসহায়ের সহায়। কেহ কোন বিপদে পড়িলে তিনি বীরের মত তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করিতেন। কোন দরিদ্র অসহায়ের উপর ধনীর অত্যাচার হইলে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতেন না। দুই এক ক্ষেত্রে তাঁহাকে এই জন্য যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে।

শরৎ সন্ধ্যা—

দুইশ চৌত্রিশ

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাহার প্রতিকার না করিয়া ছাড়েন নাই। একদিন সকালে তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া চা খাইতেছি, তিনি দক্ষিণের বারাণ্ডায় আরাম চেয়ারে বসিয়া সবেমাত্র চায়ের বাটী শেষ করিয়া খড়-পড়ার নল টানিতেছেন, এমন সময় গ্রামের গোবিন্দ জেলে আসিয়া বলিল "বড় বাবু আমি খেতে পাচ্ছি না, আমার কি হবে?" তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন—"এস—তোমায় খাইয়ে দিই! বাবুর বাড়ীতে খেতে পারো না?" সে বেচারা অবাক্, আমিও তাই। মিনিট পাঁচ ছয় পরে বলিলেন "কি করতে হবে আমায়?" সে বলিল, "আমার নৌকা-খানি ভেঙ্গে চড়ায় পড়ে আছে"। তিনি বলিলেন "ও, আমায় গিয়ে বুঝি তাতে দাঁড় বইতে হবে"?

তারপর তাহার খাটো হেঁড়া ময়লা কাপড়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এদের কেন যে বেঁচে থাকা!" পরে বলিলেন "এখন যা গোবিন্দ, মুখুয্যে মশাইকে বলবো তুই তাঁর কাছেই পাবি, দেখা করিস্; কত টাকা পড়বে রে?"

গোবিন্দ বল্লে "ত্রিশ্ টাকার কম হবে না বাবু"।

কিছুদিন পরে দেখিলাম্ গোবিন্দ নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিতেছে।

কতজন কত যে অভাব অভিযোগ লইয়া তাঁহার কাছে আসিত তাহা বলা যায় না। সকালবেলা সিকি দুয়ানি খুচরা কিছু তাঁর কাছে থাকা চাই-ই। এমন অনেক দিন দেখিয়াছি যে কোন লোক

—অপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

পল্লীর শরৎচন্দ্র

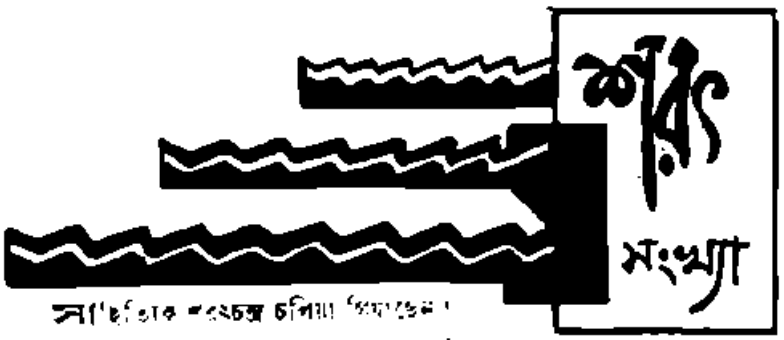

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। নানাস্থানে শোক সভার অনুষ্ঠান হইতেছে। চারিদিকেই কেবল নাই নাই ধ্বনি। তবে কি তিনি সত্যই নাই? না—আছেন, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র মরেন নাই, তিনি অমর। যিনি গিয়াছেন, তিনি আমাদের পল্লীর শরৎচন্দ্র, গ্রামের মানুষ শরৎচন্দ্র। সকলেই দলে দলে নানাস্থলে শোক-সভা করিয়া তাহার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন। যাহাদের ভাষা নাই, শক্তি নাই তাহাদের ক্ষুব্ধ বেদনা অন্তরের মধ্যেই ব্যর্থ আর্তনাদ করিতেছে।

শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে অনেক গুণগ্রাহী, দরদী, বিদ্বান ও বিদুষী অনেক কথাই লিখিতেছেন ও লিখিবেন; সে সম্বন্ধে লেখা ও আলোচনা করার অধিকার হয়ত আমার নাই, কিন্তু দীর্ঘ আঠারো বৎসর তাঁহার সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশার ফলে কত ঘটনা ও কত কথা যে মনের মধ্যে উদয় হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সব কথা লিখিবার শক্তি বা সময়ও আমার নাই। প্রাণের কথা—

রূপনন্দা—
মাঘ ১৩৪৪

প্রতি তাঁহার যে কী দরদ ছিল তাহা কেহ কেহ জানেন। শিবপুরে যখন তাঁহার বাসা ছিল সেই সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার দিদি (অনিলাবালা) ও মৃণ্ময়ী মাইকে (ভবানন্দ মুখোপাধ্যায়) দেখিতে আসিতেন ও কিছুদিন থাকিয়া আবার ফিরিয়া যাইতেন। পঞ্চু বাবু আমার আত্মীয়, আমি তাঁহাকে দাদা বলিতাম, সম্পর্কে শরৎবাবুকেও দাদা বলিতাম।

একদিন শরৎ বাবু আমাকে বলিলেন, "সতীশ, যদি আমি তোমাদের পড়শী হই ও এখানে বাস করি তা হলে কেমন হয়?" আমি বলিলাম "যা হবেনা তার জন্য উত্তর দিয়ে লাভ কি দাদা! আপনি সহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে কাদা ঘাঁটতে আসবেন, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন পরে বলিলেন, "না হে, আমি সত্যই বলছি আমি এখানে বাস করব, এই নদীটাই (রূপনারায়ণ) আমাকে

—শরৎ সংখ্যা
পৃষ্ঠা ৩৫

আরম্ভ করেছে। প্রাণটার স্বাস্থ্যও ভাল দেবানন্দপুরে আমি থাকবো না। সহর টহর আমার মোটেই ভাল লাগে না, সেখানে আমি হাঁপিয়ে উঠি"। আমি বল্লাম্ "কোন জায়গাটা আপনি পছন্দ করেন"? "কেন?" তোমার কোঠাবাড়ির ডাঙ্গার পাশে নদীর ধারে"।

"ও জায়গা তো নদীতে পড়ে যাবে দাদা, তাহলে রক্ষা করবেন্ কি করে"?

"না না, এ পন্থা নয় এর প্রতিকার আছে, শুধু আমার বাড়ী কেন—আমার পাড়ার সকলের বাড়ী রক্ষা করে দেব; আর এ গরীবগুলোকে গৃহহীন হতে দেব না"।

তারপর পদ্মলার উদ্যোগে তাঁহার সামন্তাবেড়ের গৃহাদি নির্ম্মাণ হইয়া গেল। বাসগৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা তিনি বেশী খরচ করিলেন নদীর কিনারা বাঁধিতে। আজিও "সামন্তাবেড়" তাঁহারই অনুগ্রহে নদীগর্ভে নামিয়া যায় নাই। কিন্তু এবার যে কি হইবে, কে ইট্, পাথর দিয়া তখন মেরামত করিবে, এই দুরবস্থার দিন তাঁহার দরিদ্র নিরক্ষর প্রতিবেশীগণ এখনও ভাবিবার অবসর পায় নাই।

তিনি ছিলেন গরীবের অবলম্বন, অসহায়ের সহায়। কেহ কোন বিপদে পড়িলে তিনি বীরের মত তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সর্ব্ব-প্রকারে সাহায্য করিতেন। কোন দরিদ্র অসহায়ের উপর ধনীর অত্যাচার হইলে তিনি কিছুতেই সহ্য করিতেন না। দুই এক ক্ষেত্রে তাঁহাকে এই জন্য যথেষ্ট অর্থ-ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাহার প্রতিকার না করিয়া ছাড়েন নাই। একদিন সকালে তাঁহার বাড়ীতে বসিয়া চা খাইতেছি, তিনি দক্ষিণের বারান্দার আরাম চেয়ারে বসিয়া সবেমাত্র চায়ের বাটী শেষ করিয়া গড়-গড়ার নল টানিতেছেন, এমন সময় গ্রামের গোবিন্দ ছেলে আসিয়া বলিল "বড় বাবু আমি খেতে পাচ্ছি না, আমার কি হবে"? তিনি কক্ষস্বরে বলিলেন—"এস তোমায় খাইয়ে দিই! বাবুর বাড়ীতে খেতে পারো না?" সে বেচারা অবাক্, আমিও তাই। মিনিট পাচ ছয় পরে বলিলেন "কি করতে হবে আমায়?" সে বলিল, "আমার নৌকা-খানি জেলে চড়ায় পড়ে আছে"। তিনি বলিলেন "ও, আমায় গিয়ে বুঝি তাতে ঠেলা দিতে হবে"?

তারপর তাহার খাটো ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এদের কেন যে বেঁচে থাকা!" পরে বলিলেন "এখন যা গোবিন্দ, মুখুয্যে মশাইকে বলবো তুই তাঁর কাছেই পাবি, দেখা করিস্; কত টাকা পড়বে রে?"

গোবিন্দ বল্লে "ত্রিশ টাকার কম হবে না বাবু"।

কিছুদিন পরে দেখিলাম্ গোবিন্দ নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিতেছে।

কতজন কত যে অভাব অভিযোগ লইয়া তাঁহার কাছে আসিত তাহা বলা যায় না। সকালবেলা সিকি দুয়ানি দুচয়া কিছু তাঁর কাছে থাকা চাই-ই। এমন অনেক দিন দেখিয়াছি যে কোন লোক

—স্বপনবুড়ো

শরৎ সংখ্যা—
দুইশ তৌত্রিশ

মাঘ ১৩৪৪

আসিয়া বারাণ্ডার নীচে ফুল বাগানের পাশে দাঁড়ান মাত্রই ঠক্ করিয়া কি একটা জিনিষ শরৎচন্দ্র ফেলিয়া দিলেন ও আপন্তক হাসিমুখে কপালে হাত ঠেকাইয়া চলিয়া গেল। কথাবার্ত্তা কোন পক্ষেরই শোনা গেল না। দুইজন বহু পরিচিতের মধ্যে চোখে চোখেই কাজ হইয়া গেল। কাপড় ও কম্বল প্রতি বৎসরই পূজার সময় ও শীতের সময় তাঁহাকে বার্ষিক দিতে হইত। সময় সময় বলিতেন "এরা যে কত দুঃখী তা গ্রামের কেউ দেখে না"।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম "দাদা, রাসু এ যাত্রা আপনার কৃপায় বেঁচে গেল, নইলে তার বিষয় বিক্রী হ'য়ে যেত, ও বড় বিপদে পড়তো।"

"তুমি কার কাছে শুনলে"?

"কেন, সেই তো বলে বেড়াচ্ছে"।

শরৎ বাবু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন "এই লোকগুলো পাজি, নেমকহারাম, এত ক'রে বল্লাম বিষয়টী গোপন করে রেখো, তা কি হবার যো আছে! দুর্যোধন মশাই, এই শুনুন (তাঁর দিকে মুখ ফিরাইয়া) এবার বাবু পথে আমার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিলি করতে সুরু করেছেন। এদের ভাল করাও বিপদ।"

১৯২৫ সালের কথা। একদিন সকালে আমি ও আমার খুল্লতাত ভ্রাতা (শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষাল) তাঁহার বাড়ীর পশ্চিমের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম, শরৎ বাবু তাঁহার "প্রভুর" নিকট হইতে সেইমাত্র বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছেন।

আমাদের সম্মুখে পাইয়া বলিলেন— "ওহে, তোমরা একবার আমার কাছে এসো, কথা আছে"। আমরাও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম ও বারাণ্ডার একটী বেঞ্চিতে গিয়া বসিলাম। এই ভাবে প্রায় আধ-ঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। যে-ব্যক্তি ডাকিলেন তিনি তখন ফুলবাগানে জল দিতেছেন ও গোলাপ গাছের পাতা গুণিতেছেন! আমরা দুটী প্রাণী যে উপরে বসিয়া আছি সে দিকে লক্ষ্য নাই। উভয়েই বিরক্ত হইয়া পড়িলাম— কেন যে ডাকিলেন জানি না, কি যে বলিবেন কিছুই জানি না। তখন মনো-মোহন দাদা চুপি চুপি আমার কাণে বলিলেন—"আর উঠে পড়ি, বেলা হ'য়ে গেল—এবার আস্তে আস্তে পাশ কাটাই"। এদিকে গোলাপ গাছের পাতা শেষ করিয়া শরৎ বাবু তাঁহার সিঁড়ির সুবৃহৎ তুলসী বৃক্ষের মঞ্জরী ছিঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। (এই তুলসী গাছটী অনেকেই দেখিয়াছেন, শরৎ বাবুর ঘরে এই গাছটী একটি দেখিবার জিনিষ হইয়া উঠিয়াছিল) আমরা উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় হুঁস হইল যে আমরা দুইজনে নির্ব্বাক ও আড়ষ্ট হইয়া তাঁর আজ্ঞা পালন করিতেছি।

"এই যে তোমরা বসে আছ; চা খেয়েছ"? বলিয়া খোঁজ লইলেন, আমরা বলিলাম, "না, বেলা হয়ে গেছে চা আর খাব না দাদা"। তারপর বারাণ্ডার পার্শ্বে তাঁহার লিখিবার ঘরের পাশে আরাম চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—"আজ সতীশ, আমার

মনের সুখ নাই, "প্রভু" বড়ই বিরক্ত হয়েছেন, শাস্তি না দিয়া ছাড়বেন না"। আমি বলিলাম—"প্রভু কে দাদা"?

"তাও জানো না? ঐ যে", বলিয়া নদীর উপরে বাঁশের চাঁচ দেওয়া জায়গা কয়টি বিশেষ স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। তারপর কতদিন কতবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমার প্রভুর অনুমতি ছাড়া সকালের দিকে আমার কোথাও আর যাবার উপায় নেই।"

আমাদের ডাকিয়া যে তিনি কি কথা বলিবেন তাহাই ভাবিতে ছিলাম। তিনি বলিলেন, "বনমোহন, তোমরা নাকি একটি মেয়ে ইস্কুল বসিয়েছ—ভালই করেছ, সব চেয়ে ভাল হয়েছে ইস্কুল ঘরখানি। আহা যেমন আলো তেমন বাতাস! উপরে ছাউনির বালাই নেই, চারিদিকে দেওয়ালের হ্যাঙ্গাম নাই, আসবাবপত্রও সুন্দর। কিন্তু রোদের সময় ছাত্রীরা না হয় মেট আড়াল দিলে, বর্ষায় কি হবে বলো তো? তখন তো বেচারীরা মেটে জল আটকাতে পারবে না।"

আমরা হাসিতে লাগিলাম, পরে বলিলাম, "কেন দাদা, পিটুলি গাছটার তো পাতা আছে, হাট থেকে খেঁজুর চাটাই কিনে দিয়েছি আমরা এর বেশী সম্বল কোথায় পাব? গ্রামের কায়ো কায়ো মত যে, মেয়ে ইস্কুল তুলে দাও। মেয়েদের লেখা-পড়া শিখিয়ে লাভ নাই তার চেয়ে বরং একটি পাঠশালা বসিয়ে দাও। সেই দুঃখে শরৎ সংখ্যা—

দুইশ ছত্রিশ

অভিমানে ও লজ্জায় গাছতলায় খেঁজুর চাটাই পেতেছি।"

এই কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্রের কষ্ট হইল। তিনি কিছুক্ষণ কোন কথা বলিলেন না, পরে বলিলেন, "আচ্ছা আমিও তোমাদের একজন। তোমরা আর বুড়োদের কাছে যেও না।"

আমি বলিলাম "দাদা, বড় ত্রাস হয়, কষ্টও হয়।"

"অমন ছোট খাটো কত প্রকারের কত কষ্ট নিয়তই পাচ্ছি সতীশ, আমার কড়া পড়ে গেছে। সেদিন —বাবু হাই স্কুলের চাঁদার জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি কিন্তু পারবোনা বলেছি, গালা গালিও তার জন্যে অলক্ষ্যে পাচ্ছি। তা যাক তোমরা, আর ওদের কাছে approach করে নিজেদের ব্যথা বাড়িও না। ওদের কি বুদ্ধি জান, গোড়া কেটে ডগায় জল দেয়। এই মেয়েদের অবজ্ঞা করে আমাদের যে কি মহাপাপ বাড়ছে তা এরা ভাবে না।"

সেই দিন থেকেই শরৎচন্দ্র আমাদের এই বালিকা বিদ্যালয়টি পিটুলি গাছের তলা হইতে কুড়াইয়া লইয়া ইহার প্রায় সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই বালিকা বিদ্যালয়ের (আমতা উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়) প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

কলিকাতার 'আনন্দ পরিষদ' শরৎবাবুর হাতে 'অরক্ষনীয়া'র charity play করিয়া কিছু টাকা দিয়াছিলেন। সেই টাকা

—ব্রহ্মানন্দা

মাঘ ১৩৪৪

আসিয়া বারান্দার নীচে ফুল বাগানের পাশে দাঁড়াইবা মাত্রই ঠক্ করিয়া কি একটা জিনিষ শরৎচন্দ্র ফেলিয়া দিলেন ও আগন্তুক হাসিমুখে কপালে হাত ঠেকাইয়া চলিয়া গেল। কথাবার্ত্তা কোন পক্ষেরই শোনা গেল না। দুইজন বহু পরিচিতের মধ্যে চোখে চোখেই কাজ হইয়া গেল। কাপড় ও কম্বল প্রতি বৎসরই পূজার সময় ও শীতের সময় তাঁহাকে বার্ষিক দিতে হইত। সময় সময় বলিতেন "এরা যে কত দুঃখী তা গ্রামের কেউ দেখে না"।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম "দাদা, রাসু এ যাত্রা আপনার কৃপায় বেঁচে গেল, নইলে তার বিষয় বিক্রী হ'য়ে যেত, ও বড় বিপদে পড়তো।"

"তুমি কার কাছে শুনলে"?

"কেন, সেই তো বলে বেড়াচ্ছে"।

শরৎ বাবু রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন "এই লোকগুলো পাজি, নেমকহারাম, এত ক'রে বল্লাম বিষয়টী গোপন করে রেখো, তা কি হবার যো আছে! মুখুয্যে মশাই, এই শুনুন (তাঁর দিকে মুখ ফিরাইয়া) এবার বাবু পথে আমার বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বিলি করতে সুরু করেছেন। এদের ভাল করাও বিপদ।"

১৯২৪ সালের কথা। একদিন সকালে আমি ও আমার খুল্লতাত ভ্রাতা (শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষাল) তাঁহার বাড়ীর পশ্চিমের রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম, শরৎ বাবু তাঁহার "প্রভুর" নিকট হইতে সেইমাত্র বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছেন।

আমাদের সম্মুখে পাইয়া বলিলেন—"ওরে, তোমরা একবার আমার কাছে এসো, কথা আছে"। আমরাও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম ও বারান্দার একটী বেঞ্চিতে গিয়া বসিলাম। এই ভাবে প্রায় আধ-ঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। যে ব্যক্তি ডাকিলেন তিনি তখন ফুলবাগানে জল দিতেছেন ও গোলাপ গাছের পাতা গুণিতেছেন! আমরা দুটী প্রাণী যে উপরে বসিয়া আছি সে দিকে লক্ষ্য নাই। উভয়েই বিরক্ত হইয়া পড়িলাম—কেন যে ডাকিলেন জানি না, কি যে বলিবেন কিছুই জানি না। তখন মনোমোহন দাদা চুপি চুপি আমার কাণে বলিলেন—"আর উঠে পড়ি, বেলা হ'য়ে গেল—এবার আস্তে আস্তে পাশ কাটাই"। এদিকে গোলাপ গাছের পাতা শেষ করিয়া শরৎ বাবু তাঁহার সিঁড়ির সুবৃহৎ তুলসী বৃক্ষের মঞ্জরী ছিঁড়িতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। (এই তুলসী গাছটী অনেকেই দেখিয়াছেন, শরৎ বাবুর ঘরে এই গাছটী একটি দেখিবার জিনিষ হইয়া উঠিয়াছিল) আমরা উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় হুঁস হইল যে আমরা দুইজনে নির্ব্বাক ও আড়ষ্ট হইয়া তাঁর আজ্ঞা পালন করিতেছি।

"এই যে তোমরা বসে আছ; চা খেয়েছ"? বলিয়া খোঁজ লইলেন, আমরা বলিলাম, "না, বেলা হয়ে গেছে চা আর খাব না দাদা"। তারপর বারান্দার পার্শ্বে তাঁহার লিখিবার ঘরের পাশে আরাম চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—"আজ সতীশ, আমার

স্নানযাত্রা—
মাঘ ১৩৪৪

মনের সুখ নাই, "প্রভু" বড়ই বিরক্ত হয়েছেন, শাস্তি না দিয়া ছাড়বেন না"। আমি বলিলাম—"[illegible]"?

"তাও জানো না বুঝি রে", বলিয়া নদীর উপরে বাঁশের চাঁচ দেওয়া ডাকঘর কয়া বিশেষ স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। তারপর কতদিন কতবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমার প্রভুর অনুমতি ছাড়া সকালের দিকে আমার কোথাও আসা যাবার উপায় নেই"।

আমাদের ডাকিয়া যে তিনি কি কথা বলিবেন তাহাই ভাবিতে ছিলাম। তিনি বলিলেন, "মনমোহন, তোমরা মাঝি একটি মেয়ে ইস্কুল বসিয়েছ—ভালই করেছ, সব চেয়ে ভাল হয়েছে ইস্কুল ঘরখানি। আহা যেমন আলো তেমন বাতাস! উপরে ছাউনির বালাই নেই, চারিদিকে দেওয়ালের ছ্যাঁদাম নাই, আসবাবপত্রও সুন্দর। কিন্তু রোদের সময় ছাত্রীরা না হয় মেট আড়াল দিলে, বর্ষায় কি হবে বলো তো? তখন তো বেচারীরা ছেটে জল আটকাতে পারবে না।"

আমরা হাসিতে লাগিলাম, পরে বলিলাম, "কেন দাদা, পিটুলি গাছটায় তো পাতা আছে, হাট থেকে খেঁজুর চাটাই কিনে দিয়েছি আমরা এর বেশী সম্বল কোথায় পাব? গ্রামের কারো কারো মত যে, মেয়ে ইস্কুল তুলে দাও। মেয়েদের লেখা-পড়া শিখিয়ে লাভ নাই তার চেয়ে বরং একটি পাঠশালা বসিয়ে দাও। সেই দুঃখে শরৎ সংখ্যা—

দুইশ ছত্রিশ

অভিমানে ও লজ্জায় পাছতলায় খেঁজুর চাটাই হোতেছি।"

এই কথা শুনিয়া শরৎচন্দ্রের কষ্ট হইল। তিনি কিছুক্ষণ কোন কথা বলিলেন না, পরে বলিলেন, "আচ্ছা আমিও তোমাদের একজন। তোমরা আর বুড়োদের কাছে যেও না।"

আমি বলিলাম "দাদা, বড় রাগ হয়, দুঃখও হয়।"

"আমার ছোট খাটো কত প্রকারের কত কষ্ট নিয়তই পাচ্ছি সতীশ, আমার কড়া পড়ে গেছে। সেদিন—বাবু হাই স্কুলের চাঁদার জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন। আমি কিন্তু গালমোনা বলেছি, গালা গালিও তার জন্যে অনেক্ষে পাচ্ছি। তা যাক তোমরা আর ওদের কাছে approach করে নিজেদের ব্যথা বাড়িও না। ওদের কি বুদ্ধি আছে, গোড়া কেটে ডগায় জল দেয়। এই মেয়েদের অবস্থা করে আমাদের যে কি মহাপাপ বাড়ছে তা এরা ভাবে না।"

সেই দিন থেকেই শরৎচন্দ্র আমাদের এই বালিকা বিদ্যালয়টি পিটুলি গাছের তলা হইতে কুড়াইয়া লইয়া ইহার প্রায় সকল ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই বালিকা বিদ্যালয়ের (আমতা উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়) প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

কলিকাতার 'আলবার্ট থিয়েটার' শরৎবাবুর হাতে 'অরক্ষণীয়া'র charity play করিয়া কিছু টাকা দিয়াছিলেন। সেই টাকা

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

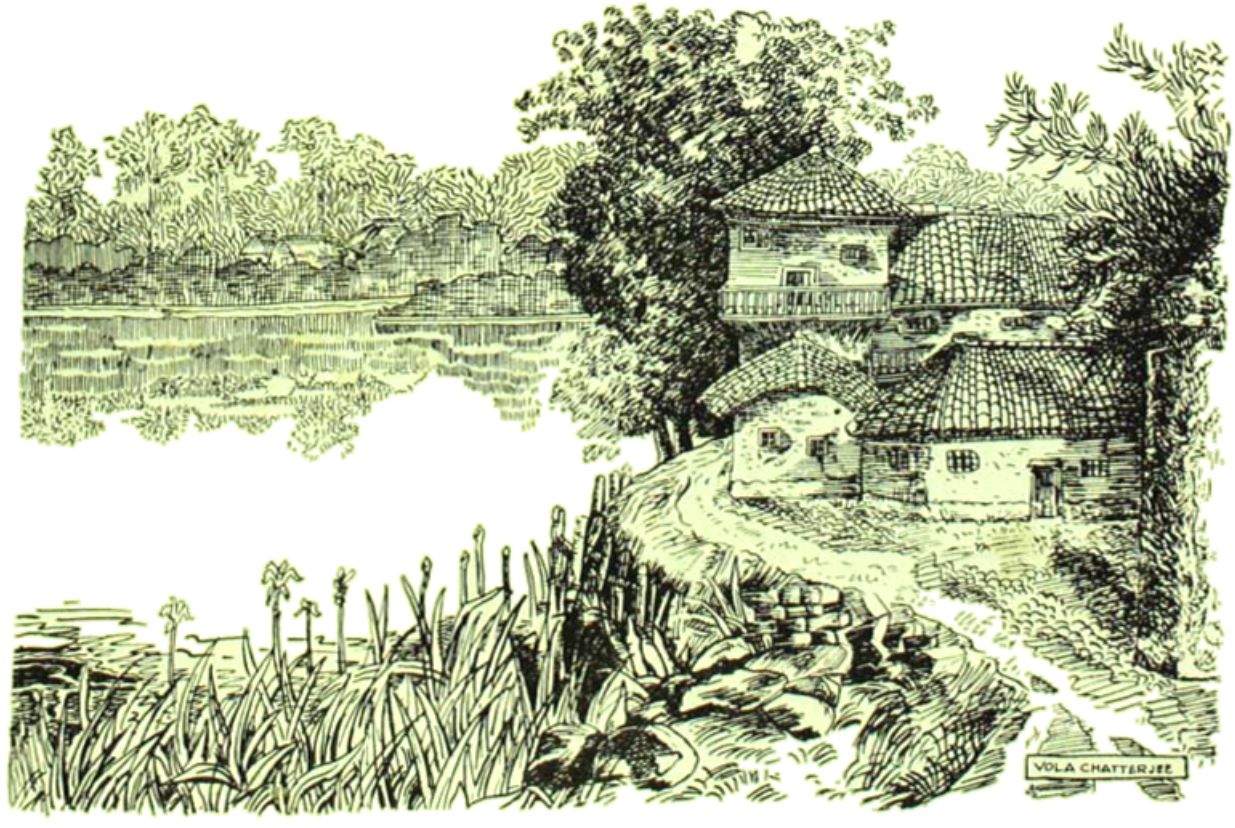

শরৎচন্দ্রের বাড়ী।

পাইয়া তিনি বিদ্যালয়ের পাশে একটি পচা খানা পরিষ্কার করাইয়া ছোট সুন্দর পুষ্করিণী কাটাইয়া দিয়াছেন। যখন এই পুষ্করিণীটি কাটান হইতেছিল সেই সময় নিউ থিয়েটার্সের শ্রীযুক্ত অমর মল্লিক ও তাঁহার অনেক বন্ধু শরৎবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, শরৎবাবু তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া স্কুলের পাশে পুকুর ধারে লইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন "অমর, আমার এ স্কুলটা বড় গরীব, তোমায় এর একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

শেষে কলিকাতায় যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আমায় ডাকাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "সতীশ, আমার সময় এসিয়ে এসেছে আর দেরী নেই, ইস্কুলটায় অনেক কিছু করবার ইচ্ছা ছিল, পারলাম না— অসমাপ্তই র'য়ে গেল।"

গ্রামের সামান্য সাধারণ লোকদের সহিত তিনি অবাধ মেলামেশা করিতেন; বাহিক দেখিলে তাঁহার মেজাজ অনেকেই বুঝিতে পারিত না। যে কেহ তাঁহার বাড়ীতে যাইলে তিনি গল্প আরামনে মাতাইয়া রাখিতেন, কেবল বৈকালে এই ভাবের ক্রটী দেখা যাইত। বেলা তিনটা বাজিলে দাবার আড্ডা বসিত। নিজে খেলিতেন না, চাল বলিয়া দিতেন। এই সময় তাঁহার সামনে পাওয়া যাইত না। হাজার প্রয়োজন থাকিলেও অর্থ মনে স্থানে ফেরা ছাড়া উপায় ছিল না। দাবার আসর ভাঙ্গিলে এই ক্ষুণ্ণ ছাড়িয়া যাইত, আবার নূতন মানুষের আবির্ভাব হইত।

রূপনারায়ণ—
মাঘ ১৩৪৪

—গাঙ্গুলী উহাদের মধ্যে ছিলেন একজন; তিনি ছিলেন একটু কালা। তাঁহাকে লইয়াই শরৎচন্দ্র এই আসরে 'রসের' সৃষ্টি করিতেন, কোন কোন দিন তাঁহার পক্ষে সারথি হইয়া যুদ্ধ জয় করাইতেন। আবার কোন দিন বলিতেন "পাঁচু খুব উঁচু ধরণের খেলোয়াড়, কেউ হারাতে পারবে না; যদি কেউ পারে তাকে এককাঁদি কলা খাওয়ান হবে। কি বল হে পাঁচু।"

ভদ্রলোক দন্তহীন মুখে সরল প্রাণে প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলেন এবং শরৎবাবুর দিকে চাহিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন "আজ্ঞা, শরৎবাবু যখন বলছেন তখন ও আমারই হলা।" আসর গরম, snakeএর খেলা; শরৎচন্দ্র পূর্ব্বকার মত এই নিরীহ ভদ্রলোকের পক্ষে হাল ধরিয়া এমন চাল বলিয়া দিলেন যে সে যাত্রায় পাঁচুবাবু একেবারেই কাৎ। আমরা গোড়া থেকেই পাশে বসিয়া পেটে হাত বুলাইতেছিলাম, শরৎচন্দ্রের কৃপায় ও কৌশলে ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তারপর হরিপদ বাবুকে সে কী সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গী! হাসিয়া হাসিয়া পেটে খিল ধরিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে শেষে শরৎচন্দ্র পাঁচুবাবুর পরিবর্ত্তে কলা ও পাঁচটা খাওয়াইয়াছিলেন।

গান বাজনায় তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল একথা অনেকেই জানেন, ইদানিং নিজে গাহিতেন না তবে তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই গান বাজনার আসর বসিত। বাড়ীতে দিনকয়েক একটী রেডিও আসিয়াছিল, এখন সেইটি খারাপ হইয়া গিয়াছে। যখন

—শরৎ সংখ্যা
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হাল ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাড়ার বহু লোক তাঁর বাড়ীতে রেডিও শুনিতে আসিতেন। তিনি নিজেও অনেকদিন লোক ডাকিয়া আনিতেন।

গত আগষ্ট মাসের ১২ই আমি তাঁর একটি চিঠি পাইলাম; দেশ হইতে লিখিয়াছিলেন; বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তিনি আমায় চিঠি লিখিতেন না, লোকের দ্বারাই সংবাদ দিতেন। বুঝিলাম দু'মাস দেখা করি নাই বলিয়া "দাদা" খুব বিরক্ত হইয়াছেন। ভয় ও লজ্জা সহকারে তাঁহার বাগানে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিয়াই বারান্দায় উঠিতেছি, এমন সময় আমায় দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন "এই যে সতীশ, এস এস, বস।" "Receptionটা যেন নূতন ধরণের মনে হইল। কোন কথা না বলিয়া একেবারে পায়ের ধুলা লইলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ; কি ক'রে এলে? একে পাড়া-গাঁ তায় বর্ষাকাল!" মনোমোহনদার মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। তারপর আমার উপর গুরুতর অভিযোগ— তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন "হ্যাঁ সতীশ একটি নূতন কথা তোমার বিরুদ্ধে শোনা যাচ্ছে, সেটা সত্যি? আমি তো বিশ্বাস করিনি; এরা সবাই বলছিল"—সত্যই আমার হৃৎকম্প হইল, ভাবিলাম কি সর্ব্বনাশ! কোথা থেকে কে কি লাগালেন, আমি তো কিছুই অন্যায় করিনি, বলিলাম "কি বলছেন দাদা? আমার বিরুদ্ধে যদি কেউ কিছু বলে থাকে, আপনি তা হুট্‌াৎ বিশ্বাস করে ফেলেছেন? বিনা দুই পক্ষ তদন্তে?"

বলিলেন "আমার বিশ্বাস করায় না করায় তোমার তো ক্ষতি নেই।" আমি বলিলাম "যথেষ্ট আছে।" আমি বিপন্ন দেখিয়া বলিলেন "এরা সবাই বলে যে সতীশ তার মাকে তত্ত্যপুত্র করেছে এই ছ মাস হলো। প্রকাশদা, (শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মনোমোহন দা আরও দুই-এক-জন পাশেই ছিলেন সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। এত অসুস্থ শরীরেও যে তিনি কিরূপ হাস্য রসিকতা করিতেন একথা যিনি তাঁহার সান্নিধ্যের সুযোগ পাইয়াছেন তিনিই জানেন।

আর একদিন কোজাগরপূর্ণিমা রাত্রে আমরা কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াইতেছি। কত লোক নদী বক্ষে নৌকা বাহিয়া গান বাজনা করিতেছে, কেহ কেহ এমনি বাইচ্ খেলিতেছে। দেখা গেল একটি নৌকায় গ্যাস জ্বলিতেছে। শরৎ বাবু সেইটী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেখ দেখ, কতিপয় পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ পদ্মপল্লবেষু" আমি হাসিয়া বলিলাম "সে কি দাদা?" তিনি বলিলেন "কেন, বাপকে অসম্মান তো হয়নি। ছেলে পাঠশালে পড়েছে লেখা পড়া শিখেছে, বাপ্‌কে ভাল করে লিখবে না? তা ছাড়া পোষ্ট-কার্ডটা ভরানো চাই! দেখ দেখি এমন যে সুন্দর শরতের চাঁদ বেটারা আবার গ্যাস্ জেলেছে।"

—শ্রীপলন্দা

মাঘ ১৩৪৪

শরৎ সংখ্যা—

দুইশ আটত্রিশ

কেহ কেহ তাঁহাকে নাস্তিক বলিতেন, শুনিয়াছি। যাঁহারা এই প্রলাপ করিয়াছেন তাঁহাদের দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ বাহিরে তাঁহার সহিত আলাপ করিলে বা বাহ্যিক রীতি দেখিলে এই ভ্রম না হইয়া যায় না। তবে তাঁর ভিতর গোঁড়ামী ছিল না। একদিন পাগল ঠাকুর হরনাথের একজন প্রিয় ভক্ত (শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ চৌধুরী) তাঁহার সঙ্গে ভক্তিরসের আলোচনা করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে দেবত্তর সম্পত্তির কথা উঠিল। জীতেনবাবু অনুরক্ত বিধায় তাঁহার যাহা কিছু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপাল জিউর নামে অর্পণ-নামা করিয়া দিয়াছেন। শরৎ বাবু বলিলেন "আচ্ছা জীতেনবাবু এটা কি আপনার ভুল হলো না? আপনি যারা গেলে আপনার গোপাল আপনার ত্যক্ত সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করবার জন্য এখানে বসে থাকবেন? কিন্তু আপনার সেখানে গিয়ে গোপাল ছেড়ে থাকা চলবে তো?" জীতেন বাবু বলিলেন, "সে কি কথা বলছেন শরৎবাবু"। "হ্যাঁ ঠিকই বলছি ভেবে দেখুন না।"

"তা হলে আপনার তো শ্যামসুন্দর আছেন? তাঁর কি করবেন? আমি তো জানি আপনি আপনার শ্যামকে কত ভালবাসেন।"

"আপনি জানেন না কি? সতীশ তুমি বুঝি ওঁকে কিছু বলেছো?" আমি স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করিলাম না, মাত্র হাসিলাম। তারপর শরৎবাবু গম্ভীর ও তন্ময় হইয়া বলিতে লাগিলেন —"জীতেনবাবু, ঠাকুর নিজস্ব, যার ঠাকুর সে চলে গেলে বিসর্জনের ব্যবস্থাই শ্রেয়ঃ।"

অনেকে জানেন যে শরৎবাবু কুকুরকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। আমিও স্বীকার করি। কিন্তু অন্যান্য পশু পক্ষীদেরও কম ভাল বাসিতেন না। কুকুরের প্রতি শেষ দিকে তাঁহার বেশী সহানুভূতি ও ভালবাসা বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ তাহারা ভেলির জাত; ভেলিকে যে তিনি কত ভালবলিতেন তাহা বলা যায় না। ভেলির কথা তিনি শেষ দিন পর্যন্ত ভুলিতে পারেন নাই। বাগানে গেলে কলা পাকিলে লোকে নিজে খাইতে চাহে, কিন্তু তিনি বলিতেন "আমি ও সব খাইনে, পাখীদের জন্যে ঐসব।" নিজের গরু ছাগল সবই ছিল ও আছে, যত্নের ত্রুটি নাই; কিন্তু পরের গরু রোগা অসুখ দেখিলে তিনি ব্যথা পাইতেন। তাঁহারই বাড়ীর পাশে প্রজা তাঁতিদের একটি বাছুরকে নিজের গোলাপ বাগানে তিনি ছাড়িয়া দিয়া ঘাস খাওয়াইতেন। আমি বলিলাম "দাদা একি! এ হতচ্ছাড়া বাছুর কার? এত দু'একদিনেই ইহধাম ত্যাগ করবে। তিনি বলিলেন "এই দেখ না ব্যাটারা গরু পোষে, দুবেলা সবটুকু দুধ এর মার কাছ থেকে নিংড়ে আদায় করে নেয়, আর এটাকে খেতে দেয় না। তাই এর এই দুর্দশা। তবে এ মরবে না, দু'মাস পরে এ কি হয় এসে দেখো।" সত্য শরৎবাবুর অনুগ্রহে সে বেচারা বেঁচে তো গেলই তারপর তাকে চেনা গেল না।

—শরৎ সংখ্যা

আর একদিন কি মাস তাহা মনে নাই—প্রায় চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বকার কথা। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি আমায় না জানাইয়াই গিয়াছিলেন। আমি সে দিন কর্ম্মস্থল উলুবেড়িয়ায় ছিলাম। বেচারা শরৎবাবুর সহিত কিছুক্ষণ বসিয়া গল্পালাপ করিবেন আশা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা হয় নাই। সে দিন শরৎবাবুর চন্দনা পাখীটি অন্যান্য পাখীর সহিত উড়িয়া গিয়াছিল। তিনি পাগলের মত পাড়ায় পাড়ায় গাছের দিকে চাহিয়া তিন চার ঘণ্টা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং পাখীটিকে ধরিয়া তারপর স্নান আহার করিয়াছিলেন।

শরৎবাবু যে শুধু পক্ষী পালন ও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া দিন কাটাইতেন তাহা নহে। আত্মীয়দের প্রতি তাঁহার যতটুকু কর্ত্তব্য তাহার একটুও ত্রুটি করিতেন না। শেষ দিকে তাঁহার শরীর ও মন যে এতটা খারাপ হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যু (স্বামী বেদানন্দ)। ইনি সন ১৩৩৩ সালের ১০ই কার্ত্তিক সামতা-বেড় গ্রামে শরৎবাবুর কোলে মাথা রাখিয়া স্বধামে চলিয়া যান। এই জন্য শরৎবাবুর যে কি ভীষণ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বোঝান যায় না। ছোট ছেলের মত দৃঢ় দেহ ঝাঁকড়াইয়া সে কি ক্রন্দন! ইহার পর মাসাবধি তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়াছি। এই অবস্থায় "গীতাঞ্জলী" লইয়া তিনি অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। পড়িতেন আবার বুকের উপর বইখানি রাখিয়া দুই চোখের জলধারা কোঁচার খুঁটে মুছিতেন। তারপর পূজার ডাক আসিল। এমন কি মাত্র ৪।৫ মাস পূর্ব্বে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতাও পরলোক গমন করিলেন। একদিন বলিলেন "দিদির মত দুর্ভাগ্য প্রায় দেখা যায় না। ছেলে নাই মাত্র তিনটী মেয়ে, তাও দুটী মারা গেল। প্রভাস গেল, বুড়ো বয়সে বৈধব্য। দিদি আর বাঁচবে না।"

শরৎচন্দ্র ১৩৩৩ সাল হইতে বরাবরই ১০ই কার্ত্তিক তাঁহার প্রাণের প্রভাসের স্মৃতিপূজা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার শেষ পত্র গত ৯ই কার্ত্তিক আমি পাইয়া ছিলাম। তারপর আর পাই নাই, আর এ জীবনে পাইবও না, সব শেষ। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আর যে কত দিন বহিয়া বেড়াইব তাহা শুধু ভগবানই জানেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষাল

এ জগতে যাহার কৌতূহল কম, সে সাধারণ মনুষ্য-সমাজের একটু বাহিরে। যে দলে মনুষ্য বিচরণ করে, সে দলে তাহার মেলা চলে না; সাধারণের মতামত তাহার মতামতের সহিত মিল খায় না।——বড়দিদি

শরৎ সংখ্যা—
দুইশ চল্লিশ

—রূপনন্দা
মাঘ ১৩৩৪

মানুষ শরৎচন্দ্র

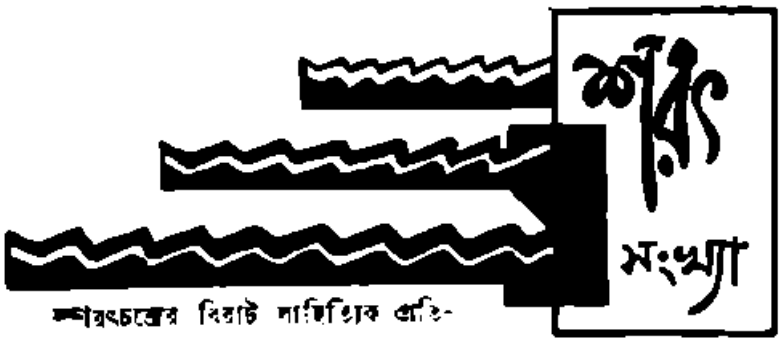

শরৎচন্দ্রের বিরাট সাহিত্যিক প্রতিভার বিশ্লেষণ করিবার যোগ্যতা আমার কোন দিক দিয়াই নাই। তাহা ছাড়া আজিকার দিনে মাত্র মহান্ স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেওয়া ছাড়া বোধ করি কোন কিছুর আলোচনা প্রাসঙ্গিকও নয়। সর্বজনপ্রিয় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক বিরাটত্ব আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠক সমাজের নিকট অবিদিত নহে। বিরাট মানুষ শরৎচন্দ্রের স্নেহমধুর ব্যবহারের সংস্পর্শে একদিন যে আসিতে পারার সৌভাগ্যে লাভ করিয়াছিলাম, আমার ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার মহিমা চিরদিনের জন্য নিজস্ব সম্পদ হইয়া রহিবে।

অকস্মাৎ আসানসোলে ছোট একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ কল্পনা মনে মনে উদিত হইল। আমার ব্যক্তিগত অক্ষম ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দেখিতে দেখিতে কাগজের কয়েক সংখ্যার পরই যেন সাফল্য গৌরবের ফুলে ফসলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কঠিন রূপনন্দা—

মাঘ ১৩৪৯

দুস্তিকার দেশের অন্তরের দিক হইতেও যেন ধীরে ধীরে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুত্থানের সূচনার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমার দুরাশা ক্রমশঃই বর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে বুঝিতে পারিলাম। মাত্র স্থানীয় সম্বাদে মন তখন যেন আর ভরিয়া উঠিতে চাহিল

সেই লেখক-লেখিকাগণের রচনা সম্ভারে "নবদূতকে" সমৃদ্ধ করিবার বাসনা আমার মনে বহুবার হইয়া উঠিল। এই প্রসঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু পল্লী-কবি কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক সাহায্য ও সাহচর্য্য একাধারে আমার প্রয়োজনে সহায়কই মাত্র হইল না, "নবদূতের" নবীন জীবনের কণ্টকাকীর্ণ যাত্রাপথে তাঁহার প্রয়োজন বড় মূল্যবান বলিয়া মনে করিলাম।

প্রকাশিত ক্ষুদ্র পত্রিকার কয়েকটী সংখ্যা একদিন সসঙ্কোচে শরৎচন্দ্রের নিকট

—শরৎ সংখ্যা

দুশ একচল্লিশ

পাঠাইবার পর যে পত্রখানি তিনি মফঃস্বলের এক অপরিচিত নগণ্য সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন সেখানি এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

সামতাবেড়, পানিত্রাস,
হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রেরিত কাগজ কয়খানি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার এই পল্লী-ভবনের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া যে এগুলি পাঠাইয়াছ তাহা কম শ্রদ্ধার চিহ্ন নয়। এ আমি বুঝি।

শ্রীমান্ কণকভূষণকে আমি কখনো দেখি নাই কিন্তু তাহার নাম শুনিয়াছি, তাহাকে বলিয়ো যে আমি আশীর্ব্বাদ করিয়াছি।

তোমরা সকলে আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি—

২৯শে আশ্বিন ১৩৩৯

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ক্ষুদ্র পত্রের কয় লাইন আশীর্ব্বাদীর মধ্য দিয়া যে স্নেহমধুর সরল প্রাণখানির পরিচয় পাইয়াছি, তাহা অনাত্মীয়ের বলিয়া মনে হয় না। তারপর যেদিন সামাজিক শরৎচন্দ্রের মধুর ব্যবহারের সহিত পরিচয় হইল—একেবারে আনন্দে অভিভূত মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাঁহার আপ্যায়নের মধ্য দিয়া অপরিচিতের জন্য স্বাভাবিক মমত্ববোধটুকুই আমার নিকট বড় মূল্যবান বলিয়া মনে হইল।

শরৎ সংখ্যা—
দুশ বিয়াল্লিশ

অন্তরের সবিশেষ প্রশস্ততা ও ঔদার্য্য না থাকিলে মানুষ মানুষকে এইরূপ একান্তভাবে ভালবাসিতে পারে না। আধুনিক কালের লেখক-সমাজের নিকট এই সব সদ্‌গুণাবলীর অভাব শুধুই নয়, বোধকরি তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনে ইহার বৈপরীত্যই পরিলক্ষিত হয়। বাংলার সাহিত্যিকগণের বর্ত্তমান অনটন ও অভাবের কথায় সেদিন যেন শরৎচন্দ্রকে বিচলিত হইতে দেখিলাম। তিনি সদুঃখে বলিলেন—

"এ দেশের লোক পয়সা খরচ ক'রে বই পড়তে চায় না হে।"

শিল্পী শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য বাঙালী ও বাংলার নিজস্ব সম্পদ। ভাবীকাল তাঁহার সাহিত্য বিচারের ভার লইবে।

তাঁহার রচিত চরিত্রগুলির সহিত যেন সত্যকার বাঙালী অন্তরের পরিচয়ের যোগসূত্র জড়িত রহিয়াছে। জাতির জীবনে ক্লীবত্বের পঙ্গুতাকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য শরৎচন্দ্রের মত সত্যকার দরদী সমাজ-বিদ্রোহীর আজ বড় প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, অবশ্য আসল নূতন সমাজ গঠন সম্ভাবনার বৃহত্তর প্রয়োজনে।

পীড়িত বিক্ষুব্ধ অসহায় মানবের মর্ম্ম-বেদনায় তিনি সার্থক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎকালের ইতিবৃত্তিকার মাত্র শুধু পীড়িত মানবের বেদনাবোধের দিক দিয়াই শরৎ-সাহিত্যের স্থান চিরদিন বাংলাদেশে অমরত্বের দাবী করিতে পারিবে। শরৎসাহিত্য তার দেশবাসীর অন্তরে

—রূপনারা
মাঘ ১৩৪৪

পতিতের জন্য সহানুভূতি ও সমবেদনার ধারাধারা আনিবার সহায়ক হইয়াছে। তাপ্যহত অসংখ্য পতিত জীবনের জন্য মন যেন আপনা-আপনিই অশ্রুভারাতুর হইয়া উঠে। শরৎসাহিত্য আমাদের কাছে একদিন আত্মীয়সম্পদরূপে গণ্য হইবে—এ আশা বোধ করি দুরাশা নয়।

আজ তাঁর মৃত আত্মার কল্যাণকামনায় সারাদেশ নীরব প্রার্থনায় যেন মৌন হইয়া রহিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি সেই মহান্ বিগত প্রাণের উদ্দেশে আমার অন্তরের নীরব প্রণতির দীন অঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। তাঁহার আত্মা অনন্তের কোলে আজ প্রশান্তিলাভ করুক—কল্যাণময় হউক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়

ইংরাজীতে দুটী কথা আছে 'Instinct' এবং 'Prejudice'; কিন্তু আমাদের আছে শুধু 'সংস্কার'। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয়; কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ, খাওয়া ছোঁয়া বস্তুটা যে 'instinct' হিসাবে সংস্কার নয় তা দা'ঠাকুরের এই হোটেলের সংস্রবে আজ প্রথম টের পাইলাম; এবং সংস্কার হইলেও যে, ইহা কত তুচ্ছ সংস্কার, ইহার বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশের এই যে অসংখ্য জাতি ভেদের শৃঙ্খল—তাহা দু'পায়ে পরিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান, সে আলোচনা এখন থাক; কিন্তু একথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করিবার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিষ রাখিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ যে কোন দেশে খাওয়া ছোঁয়ার বাচ-বিচার প্রচলিত নাই তেমন দেশে পা দেওয়া মাত্রই বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এই ছায়ার পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার শেকল কি করিয়া জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে।—শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব্ব।

অস্তমিত চাঁদ

মুরমী সাধক আজ চলে গেল বড় অভিমানে !

চলে গেল অভিমানে ব্যথিতের ব্যথার দরদী,
ম্রিয়মান অন্ধকারে হাহাকারে রোদনের গানে—
ডাকিলেও আসিবেনা বহে যাবে বিচ্ছেদের নদী।

আকাশের চাঁদ আজ ডুবে গেল কাঁদে তাই কবি,
চাঁদ নাই চাঁদ নাই জ্যোতির্ময় শরতের চাঁদ,
সতীহারা রুদ্র সম অট্টহাস্য করেতাই রবি,
শ্যামস্নিগ্ধ বনচ্ছায়া অমারাতে করে আর্ত্তনাদ।

অবোধ ঝিল্লির গানে বৃথা কাঁদে লতাগুল্ম দল
গুমরি-গুমরি হায় পল্লীবধূ কাঁদে প্রিয়হারা
অভয়া অলকা রমা সাবিত্রীর কাঁদে মর্ম্মতল
বিদ্রোহিণী কমলের চোখে শুধু নাই অশ্রুধারা।

নির্য্যাতিতা রমণীর সর্ব্বশূন্য মনের আকাশে
সান্ত্বনার শুভ্র চাঁদ অস্ত গেছে বিরহ আঁধারে
বিষাক্ত বাতাস যেন প্রেয়সীর রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসে
বিপ্লবী-নায়িকা ওগো কাঁদ চির অবরুদ্ধ দ্বারে।

আকাশেতে মেঘ নাই তবু এ কী তমিস্র রজনী !
ঘনীভূত বেদনায় মৌন ম্লান গম্ভীর আকাশ
সব্যসাচী গেল চলি হে সুমিত্রা বৃথা দিন গণি,—
কাটাইবে কালরাত্রি মর্ম্মে চাপি বিফল উচ্ছ্বাস।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্যের বাহিরে শরৎচন্দ্র

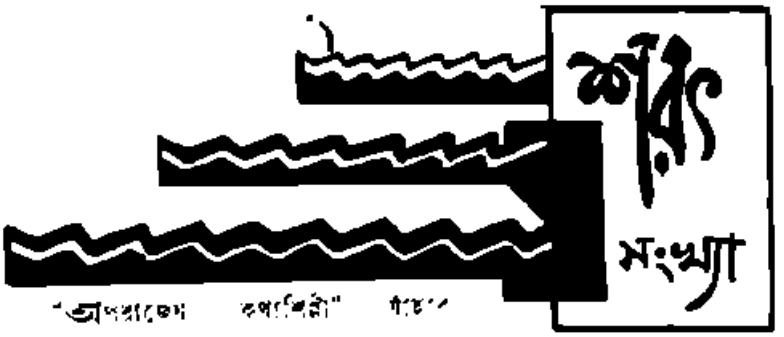

"অপরাজেয় কথাশিল্পী" রূপে প্রচলিত পরিচয় তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। মাঝে মাঝে ভোটযুদ্ধক্ষেত্রে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ছ্যাণ্ডবিল লিখিতে হইত। শরৎবাবু দুইবার আমারই লিখিত ছ্যাণ্ডবিলের ভাষায় খুশী হইয়া অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহা ছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অন্য অধিকার নাই।

কিন্তু সাহিত্যই শরৎবাবুর জীবনের একমাত্র ধ্যান ছিল আজ একথা বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সেই জন্যই সাহিত্য জগতের বাহিরে শরৎবাবুর নিকট হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাই বলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছি।

প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমার জনৈকা প্রতিবেশিনী আকস্মিক বৈধব্যের পর সহায়হীনা হইয়া দেশবন্ধুর সহধর্ম্মিণীকে পত্র লেখেন। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী সেই পত্র শরৎবাবুকে দিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন যেন এই মহিলাটীর জন্য কিছু করেন

মতামত সহিতে
আমার গৃহে

কিন্তু এই কথার আলোচনায় আসিয়া পড়িল মিউনিসিপালিটীর কথা। ইতিপূর্ব্বে হাওড়া কংগ্রেসের জনপ্রিয় কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু আমাকে এবং আমার বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায়কে মিউনিসিপালিটীর কমিশনর হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমরা দুইজনেই তখন এক নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি। অন্যপথে যাইবার স্পৃহা আমাদের ছিল না। কিন্তু শরৎবাবু ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া এই সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিতে। সেই দিনই লক্ষ্য করিলাম তাঁহার আকর্ষণী শক্তি। যেন কতদিনের পরিচিত স্নেহাস্পদকে বলিতেছেন, "যেতেই হ'বে, না গেলে

—শরৎ সংখ্যা

তারি অভাব হবে।" এত অল্প সময়ের মধ্যে এমনি ভাবে আত্মীয়তা করার মত যে উদারতা ও সরলতা তাঁহার মধ্যে ছিল তাহার প্রমাণ শেষদিন পর্য্যন্ত পাইয়াছি। সকলে সকাল বেলা তর্ক বিতর্কের পর তিনি শুধু এই কথা বলিয়াই শেষ করিলেন "তোমাকে ও জোলামাথকে আমি চাই। মিউনিসিপ্যালিটির সংস্কার-করে তোমাদের পাবার আমার একটা দাবী আছে। তোমরা না বললে আমি শুনব না—কখনই না।" এই অকপট ব্যগ্রতা আমাদের জয় করিল। ঐহিক উন্নতির ঐকান্তিক চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে নাগরিক পরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করিলাম।

তখন অসহযোগ আন্দোলনের পালা শেষ হইয়াছে; স্বরাজ্য দলের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশবন্ধু শরৎবাবুকে ঘনিষ্ট বন্ধুভাবে পাই-য়াছেন। স্বরাজ্যদলের কর্ম্মপন্থায় তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল, সেই জন্য কংগ্রেস যখন মিউনিসিপ্যালিটী capture করিবার নীতি গ্রহণ করে তখন হাওড়ার এই নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার উৎসাহের সীমা ছিল না। "কাগজে বিজ্ঞা-পন দিলে অনেক দরখাস্ত পাব নিশ্চয়ই কিন্তু সত্যিকার কর্ম্মী পাব কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেই কারণেই তোমাদের পাবার জন্য এত আগ্রহ আমার।" হাওড়া নাগরিক জীবনকে সর্ব্বপ্রকার দলিলতা ও দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিবার ঐকান্তিক কামনা লইয়াই তিনি মিউনিসিপ্যালিটী অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু আত্মকলহের বিষাক্ত আবহাওয়ার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। হাওড়া কংগ্রেস দুইভাগে ভিন্ন হইল।

স্বায়ত্ত-শাসনের বিবিধ অনুষ্ঠান অধিকার করিবার নীতি আজ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্বন্ধে পদপ্রার্থী নির্ব্বাচন করা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা সকলেই জানেন, স্থানীয় দলাদলি, ব্যক্তিগত দ্বেষ ও হিংসা মানুষের মনকে এমন ভাবে অধিকার করিয়া বসে যে মিউনিসিপ্যালিটী বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অধিকার করিতে গিয়া কংগ্রেস অনেক জায়গায় পরাভূতও হইয়াছে। একবার ব্যঙ্গচ্ছলে শরৎবাবু এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আর একটা কথা এই যে, উকিল-কমিশনর বাড়াতে আর মন চায় না। যথেষ্ট হয়েছে। ওদের কাড়াকাড়ির দাপটে কেউ আর কিছুতে এগোতেই পারছে না। এমনি যেন ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেছে, ওদের ছাড়া যোগ্যলোক আর ভূ ভারতে নেই।"

১৯৩১ সালে যখন কংগ্রেস পদপ্রার্থী স্থির করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা শরৎবাবুর উপর অর্পিত হয় তখন বিভিন্ন দিক হইতে আবেদন, নিবেদন, তর্জ্জন - গর্জ্জনে ক্লান্ত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "মাঝে মাঝে ভাবি তোমাদের সকলকে নিয়ে Election-Board তৈরি করে নিই। নিজে আপন দায়িত্বে candidate ঠিকমত বেছে বের করবার অতি দুরূহ অত্যাচারের আর বড় নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বয়সটা বড্ড বেড়েছে।"

—হাবড়া

মাঘ ১৩৪৪

এই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও তাঁর স্বাধীন চিন্তাশক্তি এবং দূরদৃষ্টি অক্ষুণ্ণ ছিল। নিজের মতটাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিতেন না। একখানা চিঠিতে বলিয়াছিলেন, "•—এর উপর আমার মন প্রসন্ন নয় হেতু তোমরা জানোই। অথচ —কে মড়ানোর যো নেই। একটা কারণ, তার ওয়ার্ডের লোকেরা তাকে একান্তভাবে চায়। —কে সরানোর চেষ্টা করলে দেশের এই দুঃসময়ে যে পরিমাণ গালিগালাজ, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হবে তা হওয়া উচিত মনে করিনে।" আরও দুইজন পদপ্রার্থী সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—" —এর মাথা কেটেচে অথচ ওর চাই একটা seat —হয়ত খাটুনেও খুব। অথচ বেশী খাটা-খাটি আমি পছন্দ করিনে। ওতে আমার উদ্বেগ বাড়ে। তবু হয়ত মন্দের ভালো। এদিকে • • Congress Creed (কংগ্রেসের অঙ্গীকার পত্র) এ চেয়ে-সই করতে নারাজ। টানাটানি করে বিনতি জানালে হয়ত একটা আঁচড় কেটে দিতেও পারে, কিন্তু তার মূল্য কতটুকু বলতো? • • • এদিকে আবার মুস্লিম লেম (মুসলমানদের দাবী) প্রায় ঠেলে পর্ব্বতে উঁতে উদ্যত। এটাতো সর্ব্বাগ্রে ঠেকানো চাই। স্থির হয়ে থাকলে বা কতক রক্ষে, কিন্তু নাড়া-নাড়ি ঠেলা-ঠেলি করতে গেলে পাছে ধোঁয়ানো আগুনে চতুর্দ্দিকের ফুঁ এসে লাগে এ আশঙ্কা সর্ব্বদাই করি। দেশের এই নিদারুণ দুর্দ্দিনে aggressive উদ্যমের চেয়ে কুণ্ঠ-ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকতর ভালোর সম্ভাবনা রূপমন্দা—

মাঘ ১৩৪৪

যদি বা না থাকে, অপেক্ষাকৃত মন্দর দুশ্চিন্তাও করে।" অযোগ্য ব্যক্তিকেও সমর্থন করিতে হয় বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে এটাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, অথচ এটাই খুব সহজে আমরা ভুলিয়া যাই।

মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচন লইয়া মাকে মাকে কত দুশ্চিন্তার ভার তাঁহাকে বহিতে হইয়াছিল, এই সব উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন "Election ব্যাপারটাকে ভয় করি। ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে নীচের পাঁক ওপরে তুলতে সঙ্কোচ বোধ হয়।" ইহার উপর যখন আফিসের কৌটাটী অদৃশ্য হইয়া যাইত তখন তাঁহার অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। একখানা চিঠিতে নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরুদ্ধ মতামতের বিশ্লেষণ করিয়া উপসংহার লিখিলেন, "এদিকে বিকেল থেকে আফিসের কৌটো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চেয়ে চিন্তে একটু খেয়েছি, সে সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মতই অকিঞ্চিৎকর। সমস্ত দুনিয়ার ওপরে যেন বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে (১৫ই মাঘ ১৩৩৭)।"

এইবার কংগ্রেসের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্পর্কের দুই একটা কথা বলিব। হাওড়া কংগ্রেসের দলাদলির সূত্রপাত হইলে তিনি অতি মাত্রায় বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। বাঙ্গালীর জীবনে দলাদলি পুরাতন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ১৯২৯ সালে হাওড়ার দুইটী দল ছিল, তাঁহাদের সম্বন্ধে এক পত্রে প্রবোধবাবুকে লিখিয়াছেন, "ওদের কাজের পদ্ধতি এবং নীতি এই যে,

—শরৎ সংখ্যা

• সাধ্যপক্ষে ইচ্ছা করিয়াই দিলাম না। দিলে তাঁহাদের প্রতি অযথা অবিচার করা হইবে, ইহাতে শরৎবাবুর আত্মার প্রতিও অবজ্ঞা করা হইবে। —লেখক।

তারা যার হোক্ একজনের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিজেদের disciplined করতে চায়, কিন্তু তোমাদের দলের সকলেই leader; সুতরাং বিবাদ এবং তর্কই তাদের সব চেয়ে বড় কাজ।" (২৬।৫।২৯) ইহা অপেক্ষা বড় সত্য কেহ বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

একবার ১৯২৯ সালে তিনি লিখিয়াছিলেন: "সত্যিকারের কাজের মধ্যে দিয়েই বড় হওয়া যায়, কেবল কাড়াকাড়ি করেই বড়ত্বের দাবী জন্মায় না।" এই সময়েই তাঁহার হাওড়ার অতিপরিচিত সহকর্মীরা মুখ-সম্মিলন লইয়া আর একদল কর্মীর সহিত ভিন্ন হইয়া পড়ে। শরৎবাবুর সহকর্মীদের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি এই সময় আরম্ভ হইল! হাওড়ার যাঁহাদের সহিত প্রথম তিনি কংগ্রেসের কাজে নামেন তাঁহারা তাঁহার বিপক্ষে যাওয়াতে বলিয়াছিলেন: "এর ফল কি হ'বে জানো? Conference প্রভৃতি জিনিস মোটের উপর তুচ্ছ ব্যাপার, হুজুগ ছাড়া মূল্য তার বেশি নয়। কিন্তু এর ভেতর দিয়ে কেবল নতুন করে একটা দলাদলির সৃষ্টি হ'ল তাই নয়, এতদিন নানাবিধ কাজে কর্মে আমার একটা authority ছিল যা হাওড়ায় সকলেই প্রায় মানতো। জোর কিছুই নেই; শুধু শ্রদ্ধা আর স্নেহের বন্ধন আমাকে খাটো করে দেবার পরিণাম আর একদিন তোমরাই দেখতে পাবে। ...দেশের কল্যাণ কামনা করেই বলি, দলাদলি আর বাড়িও না। ...কেন্দ্রীভূত শক্তিকে এই ভাবে বারম্বার খণ্ডিত করেই ভারতবর্ষ আজ চরম দুর্দশায় দাঁড়িয়েছে।" যাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন নয় বৎসর পরে তাঁহাদের সহিত শরৎবাবুর মনোমালিন্যের সূচনা হইল। ১৯২৯ সালে একদল কর্মীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন: "হাওড়ার ছেলেদের ওপর মুরুব্বিগিরি করবার গৌরবের চেয়ে আমার নিজস্ব গৌরবও কিছু আছে। তাতেই বাকি দিনকটা একপ্রকার কেটে যাবে।" নয় বৎসর পরে যখন শোনা গেল যে তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের কথাবার্তা চলিতেছে তখন দ্বিতীয় কর্মীদলকে লক্ষ্য করিয়া ঠিক এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছিলেন।

শরৎবাবু ছিলেন ছোট ছেলেদের মত বিশ্বাসপ্রবণ। তাই মাঝে মাঝে বিব্রত হইয়া পড়িতেন। কিন্তু যাঁহার মধ্যে সত্যকার গুণ দেখিতেন তাঁহার প্রতি 'স্নেহ বা বিশ্বাস এতটুকু শিথিল' হইত না। ১৯২৯ সাল হইতে যাঁহাদের সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর তাঁহাদের সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছিলেন।

সহকর্মীদের প্রতি স্নেহ এবং দেশসেবায় জন্য যাঁহারা দীনাবস্থায় পড়িয়াছিল তাঁহাদের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। ১৯২২ সালে তিনি বলিয়াছিলেন: "আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার অক্ষয়তম অধিকার যদি কারও থাকে ত সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। মহাত্মাজী আজ কারাগারে।...কিন্তু যে আশা তাঁর একার ছিল, সমস্ত দেশের

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

লোকের সে ভরসা করবার সাহস হোলো না। তাদের অর্থে পার্টি মেকে মুক্ত করে আহার নিদ্রা অব্যাহত চলতে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের কোথাও এতটুকু বিঘ্ন হোলো না; শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচতে লাগলেন।...এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিভ্রমনায় ছুতো তুলছে—Non-violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধিজির movement কি practical?—কিন্তু কে তাদের বুঝিয়ে দেবে, কোন movement টা কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। ...এখনও একদল লোক আছে, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে। এরা কারা জানেন? একদিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল...এরা তাদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাদের কি গড় করিয়েছেন জানেন?—আজ তারা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত, পীড়িত, ভিক্ষুকের দল।...মহাত্মাজীর আন্দোলন থাক বা যাক এদের অশ্রদ্ধের করে আনবার, দীন হীন ব্যর্থ করে তোলবার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের লোককে একদিন করতেই হবে, যদি ভার ও ধর্ম সত্য-কার বিধিবিধান কোথাও কোনখানে থাকে।"

কংগ্রেসের আত্মকলহ বন্ধ করিবার চেষ্টা তিনি একাধিকবার করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালের ২৬শে জুন তারিখে এক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন,—"একদিকে আত্মমোহ, সংশয় ও কলহ, অন্যদিকে রাজ-শক্তির প্রবল বিরুদ্ধতা—এই উভয় গ্রহের সংঘর্ষে পড়িয়া আমাদের হাওড়ার জাতীয় রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান এতদিন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও একান্ত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আজ পুনর্গঠন কার্যে ব্রতী হওয়া মাত্রেই চোখে পড়িয়াছে নীতির বিরোধ; লক্ষ্যের বিভিন্নতা না থাকা সত্ত্বেও শুধু যেন ভূতগ্রস্তের মতোই এতদিন আমরা নিষ্ফল বিবাদে লিপ্ত হইয়া নিরন্তর আত্মক্ষয় করিয়াছি। শুধু আমরাই নয়, এমন বিরোধ বাঙলার বহুস্থানে ঘটিয়াছে। বিবাদের সমস্ত কারণ জানি না। তথাপি একথা অকপটেই বলিব যে, মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহে সমাধান করা যায় না এমন সমস্যাই নাই।"

শরৎবাবুর এই নিবেদন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যায় এবং ধীরে ধীরে তিনিও তাঁহার হাওড়ার সর্বাপেক্ষা পুরাতন সহ-কর্মিগণ কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রায় নয় বৎসর পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন, "নিজের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের কাজের মধ্যে এখনো লিপ্ত হ'য়ে আছি। আমি জানি আমার শক্তি-সামর্থ্য গেছে, তথাপি মিথ্যে বলপতি সেজে যশ অর্জনের আমার না আছে স্পৃহা না আছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা"। ১৯৩১ সালে লিখিয়াছিলেন, "স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এরা আর আমার কথা শুনবে না। আমার President থাকার দিন শেষ করবার প্রয়োজন এসেছে।

—শরৎ সংখ্যা

রূপনারা—

মাঘ ১৩৪৪

ত্রিশ উনপঞ্চাশ

[illegible] কংগ্রেসের [illegible] স্থান পায়নি বলে তোমরা
কলহের সৃষ্টি করেছিলে সেই কলহের
ছুঁইয়েছেই [illegible] এমন
কতিপয় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিতে বাধ্য
হয়েছে, যাদের প্রশ্রয় দেওয়া দেশহিতৈষীর
বলা যেতে পারে। ছুই দলেই সেইরূপ
আছে, কংগ্রেসের নীতির দিক
অনাচার তাদের কাছে সেটা
আদরণীয় বরণীয় বা বন্দনীয়।"
শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত উভয় দলের সহিত
সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু
সুভাষবাবুর উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও
স্নেহ ছিল তাঁর একমাত্র আশা ছিল
যে সুভাষবাবু বাঙলার দলাদলি শেষ করিতে
পারিবেন; এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে
সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার ছিল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

[illegible] সম্বন্ধে একদা
বলিয়াছিলেন,—"ভুল
সকলেই করে কিন্তু ভুল স্বীকার
করবার সাহস খুব কম লোকের আছে,
[illegible] ভাল লোক
[illegible] দিন না
[illegible] আছে-

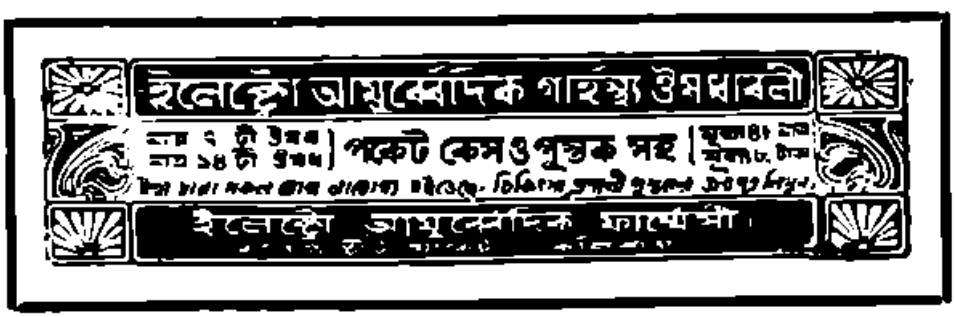

সাধারণে অসাধারণত্ব

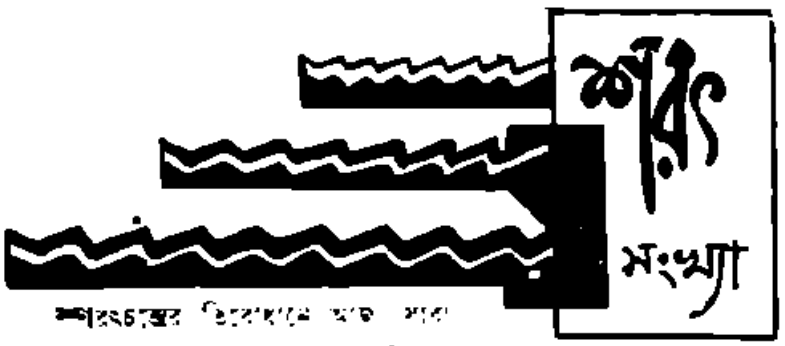

শরৎচন্দ্রের তিরোধানে আজ সারা বঙ্গদেশ থেকে মুহ্যমান প্রতিধ্বনি উঠছে একটা জাতি এই ভাবেই আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত স্বীকার ইহা কিছু নূতন কিন্তু এক্ষেত্রে একটা করিলাম যাহা একটু মনে হইল। সে জিনিসটি এই যে, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুটাকে সাধারণে বাঙ্গালী শুধু একটা সাহিত্যিকের জাতীয় ক্ষতি বলিয়াই গ্রহণ করে নাই, সেই সঙ্গে তাহার মতো ব্যক্তিত্ব ক্ষতির করে, নিকট হইতে তাহারা পাই প্রতিধ্বনি উঠাতে সাধারণে যে সে দুঃখ নিতান্তের ব্যক্তিগত- অভাববোধ-প্রসূত নয়, সমগ্র জাতির ক্ষতিকে নিজের বলিয়া করিয়া লওয়ার প্রয়োজ ফল। প্রতিভার

করিবে।
মাত্রই অনেক
রূপনন্দা—
মাঘ ১৩৪৬

ক্ষতির কথা
সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত-
—শরৎ সংখ্যা
৩য় একায়

ভাবে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে।

এইখানেই শরৎ-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। অনন্য-সাধারণ শরৎচন্দ্রের মধ্যে কোথায় একটি অতি সাধারণ শরৎচন্দ্র বাস করিত। এই লোকটি তার সমসাময়িকের সাধারণ বাঙালীকে কোনদিন ভুলিতে পারে নাই। তাই শরৎসাহিত্যে শুধু রসিকজনের সূক্ষ্ম রসবোধকে পরিতৃপ্ত করিবার মত মাল-মসলাই প্রচুর নাই, সেই সঙ্গে সাধারণ বাঙালী যাহা চায়, সাধারণ বাঙালী যাহা পাইলে খুসী হয়, আনন্দিত হয়, এইরূপ উপাদানও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পে সূক্ষ্ম চরিত্র বিশ্লেষণ আছে; অচেতন মনের অনেক গোপন কথা আছে, গতানুগতিক সমাজ-নীতির সূক্ষ্ম সমালোচনা আছে; আমাদের নীতিবোধের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক নূতন প্রশ্ন, নূতন জিজ্ঞাসা আছে। এমনি আরও কত জটিল সূক্ষ্ম ব্যাপার। কিন্তু এই সকল ব্যাপার তাঁর উপন্যাস গল্পের মানুষগুলিকে কোনদিন আড়াল করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। এই সকল ব্যাপার তাঁর সৃষ্ট জীবগুলিকে কোনদিন প্রাণহীন করিয়া তুলিতে পারে নাই। এই সব জটিল ব্যাপার যে সকল চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেগুলি একেবারে আমাদের ঘরের মানুষ। তাছাড়া তাহাদের জীবনের ভিতর দিয়া যে সকল সত্য জন্মিয়া উঠিয়াছে তাহা যেমন সরল তেমনি কৌতূহলপ্রদ।

শরৎ সাহিত্যে—

দুঃখ বাহাল

শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার চরিত্র অনেক সময় অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক সময় সেগুলি এত জটিল এবং সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে যে নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং রসিক পাঠক ছাড়া কেহ তাহাদের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই সকল জটিল সূক্ষ্ম চরিত্রের চারিপাশে শরৎচন্দ্র যে সকল অসংখ্য ছোটখাটো সোজা চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন সেগুলি এত স্বাভাবিক, এত স্পষ্ট, এত বাস্তব, এত প্রত্যক্ষ, এত সাধারণ, যে এই সকল চরিত্রের স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে একেবারে নিজেদের আপনার জন বলিয়া চিনিয়া লইতে সাধারণ পাঠকদের এতটুকু বেগ পাইতে হয় না।

এইভাবে শরৎচন্দ্র আপনার অনন্য সাধারণ রসসৃষ্টিকে ঘুরে এবং নিকটে সমানভাবে সঞ্চালিত করিয়া সূক্ষ্মকে এবং স্থূলকে, কল্পনাকে এবং বাস্তবকে, আদর্শকে এবং প্রত্যক্ষকে একটি সুশোভন সামঞ্জস্যের শ্রীতিবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন। তাই সূক্ষ্মদর্শী রসিক শিক্ষিত বাঙালী চিত্ত নয় শুধু, অতি সাধারণ অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী পাঠক-পাঠিকার নিছক গল্পপিপাসুচিত্তকেও তিনি জয় করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার তিরোধানে অতি সাধারণ বাঙালীও আজ শোকগ্রস্ত; জাতীয় ক্ষতির দিকে চাহিয়া নয়, নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষতির পানে সজ্ঞানে সচেতনভাবে চাহিয়া।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

E. L. A. Fournier

শরৎদার কথা

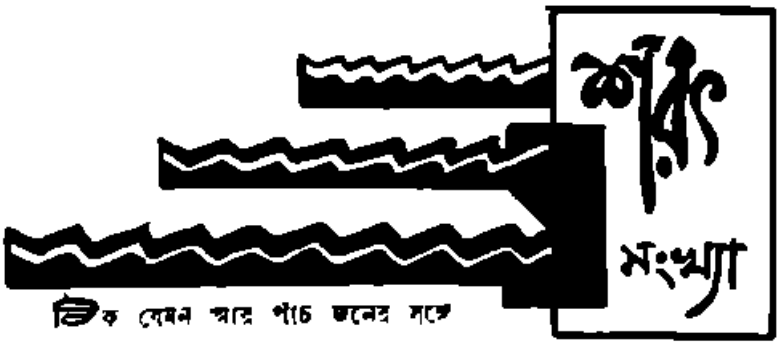

ঠিক যেমন আর পাঁচ জনের সঙ্গে পরিচয় হয় তেমনি ক'রে আমার প্রথম যৌবনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আজ স্মৃতিকথা লিখতে বসে সেই পরিচয়ের দিনটির কথাই মনে পড়ছে।

সে আজ ৩৫।৩৬ বছরের কথা। সেই সময় আমার সহপাঠী প্রতিবেশী বাল্য-বন্ধু ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে এসে বললে, 'চল্ শীগগির আমার বাড়ী।' আমি তার রকম দেখে এবং টানাটানিতে বিরক্ত হ'য়ে হঠাৎ এমনি ভাবে তার বাসায় নিয়ে যাবার এমন ব্যগ্রতার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। কিন্তু প্রথম আমার কাছে কিছু ভাঙেনি, আমাকে একরকম জোর করেই তার বাসায় নিয়ে গেলো। তার বাসা ছিল আমাদের দু'তিন-খানা বাড়ীর পর একটা মেসে। প্রথম আমাকে তার দোতালার ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বললে, "দেখচিস্ কে এসেচে?"

প্রমথর তক্তাপোষের মাথায় গুটানো-বিছানায় ঠেস্ দিয়ে ব'সে পা দুটো লম্বা ক'রে ছড়িয়ে চাদর-কোট পরা একটি ২৫।২৬ বছরের দীর্ঘ লোক বসে সিগারেট খাচ্ছে, আমাকে দেখেই কতকালের পরিচিতের মতো সম্ভাষণ ক'রে বললে, "এসো ভূপেন।"

প্রমথ কিছু বলবার আগেই বেশ মনে আছে, আমি বলে ফেলুম, "শরৎদা!"

প্রমথ হাসতে হাসতে বললে, "খুব আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছ। সত্যি বলছি শরৎদা, আমি ওকে একবারও বলিনি তুমি এখানে এসেচো, তবে তোমার অনেক গল্প ওর কাছে করেচি।"

শরৎচন্দ্র বললেন, "আমি ঠিক জানতুম, ভূপেন আমাকে চিনতে পারবে।"

সে আজ কত—কতকালের কথা, তবু মনে হয় কালকের ঘটনা। সেই দিন থেকে কতদিন কতরাত্রি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কেটেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখলে সে এক দ্বিতীয় মহাভারত হয়; আর সে সব লেখা সম্ভবও নয়, আজ তার প্রসঙ্গ লিখতে বসে আমার শুধু এই কথাই মনে পড়ছে

—শরৎ সংখ্যা

মাঘ ১৩৪৪

ভূপেন্দ্র ভিলায়

প্রথম আলাপেই ঐ অপরিচিত শরৎচন্দ্র কেন আমাকে এতো গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছিল? কেন আমি তাঁর নিত্য সহচর হয়েছিলুম? রাস্তার ঘাটে কেন অকারণে তাঁর সঙ্গে মনের আনন্দে তন্ময় হয়ে ঘুরে বেড়াতুম? তাঁর বিত্ত ছিল না, তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল না। বাইরের লোকের দৃষ্টিতে তিনি তখন ছিলেন একঘুরে, তবু সেই প্রথম যৌবনে শরৎচন্দ্রের প্রতি যে এমন গভীর আকর্ষণ বোধ করেছিলুম, তার একমাত্র কারণ, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'অন্তর-ধনে চিরধনী অন্তরবিহীন বিত্তে।' আজ তাঁর মৃত্যুতে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার এই কথাই মনে পড়ছে; ঘাঁটি মজলিসী বাঙালী কলতে যা বুঝায় তার শ্রেষ্ঠ এবং শেষ নিদর্শন এই শরৎচন্দ্র, যিনি অবিশ্রাম গল্পে হাসিতে রসিকতায় মজলিসে সবাইকে মশগুল ক'রে রেখে দিতে পারতেন—সংসারে সে আনন্দ সৃষ্টির বুঝি তুলনা নেই। সে মজলিসে যারা কখনো উপস্থিত হয়নি তারা বুঝতেই পারবে না কতবড় আনন্দের উৎস ছিলেন মানুষ শরৎচন্দ্র। আজ শরৎচন্দ্রের গল্প সাহিত্য সমস্ত বাঙলার নরনারীকে রস দিয়েছে, গভীর আনন্দে তারা আত্মহারা। সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, এমন হৃদয়গ্রাহী করে গল্প শরৎ-চন্দ্রের মতো কেউ লিখতে পারেনা। সত্যতা আজ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু আমার মনে হয় শরৎচন্দ্রকে ঘাঁরা আমার মতো খুব কাছ থেকে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করবেন, শুধু গল্প লেখার নয় মুখে গল্প করে মজলিস মাতিয়ে মানুষকে আনন্দ দিতেও তাঁর জোড়া বাঙলা দেশে মিলত। কী হৃদয়গ্রাহী তাঁর গল্প, কী সে রসিকতা, তার তুলনা নাই। এমন পরিপূর্ণ প্রাণের প্রাচুর্য, এমন সরলতা বুঝি জীবনে কমই দেখেছি, অথচ তাঁর মজলিস ঘাঁটি বাঙালীর মজলিস। শুধু তাঁর মজার গল্প তাঁর হাসিতে গল্পে রসিকতায় অকৃত্রিম বাঙালী-পনা কী সুন্দর ভাবে ফুটে উঠত! তাঁর সব কিছু ছিল ঘাঁটি বাঙালীর।

অনেকদিন আগেকার সব কথা মনে পড়ে। একদিন রাস্তায় (যাকে বলে accidentally) শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। তখন তিনি বর্মা থেকে ফিরে এসে শিবপুরে বাস করছেন, খ্যাতিও কিছু হয়েছে; আমরা দু'জনেই খুব খুশী হয়ে দেখা হতে। আর কি, জলে জল মিশে গিয়ে যেমনের বেগে দু'জনেই ছেলে পড়লুম। অনেকক্ষণ দু'জনে গল্প করতে করতে বেড়িয়ে রাত্রি দশটা বেজে গেলো। শরৎচন্দ্র বললেন, 'চলো ভূপেন, আমাকে একটু এগিয়ে দেবে।'

'তথাস্তু চলো' বলে গল্প করতে করতে মাত্র একটু এগিয়ে দিতে গিয়ে, একেবারে তাঁর বাড়ে শিবপুরের বাড়ীর সামনে উপস্থিত পায়ে হেঁটে। শরৎচন্দ্র বললেন, —তাইতো ভূপেন, অনেক দূর এসে পড়লে গল্প করতে করতে, চা খেয়ে যাও।

তাঁর বাড়ীতে পায়ারীর গল্প বিদায় নেবার উপক্রম করছি, তিনি বললেন,

—রূপনারায়ণ

মাঘ ১৩৪৪

পথ তো কম নয়, চলো গল্প করতে করতে তোমার সঙ্গে খানিকটা যাই। দু'জনে আবার পথে বেরলুম। আমার বেশ মনে আছে, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দুটি ভদ্রলোক ভয়ানক মাতলামি করছিল আর দের সামনে। জিনিষটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর কিন্তু শরৎচন্দ্রের গল্পের জন্যে আজও সে কথা ভুলতে পারিনি। শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে আমাকে বললেন,—দেখেছো ভূপেন, কি রকম সিঁদুর খেয়েছে।

আমি সাগ্রহে বললুম,—সিঁদুর কি শরৎদা?

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন,—সে এক ইতিহাস। এক পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলের পানদোষ হয়। পাড়ার জিনিষটা জানাজানি হয়ে গেলে পাড়ার এক পরোপকারী পণ্ডিতমশাইকে এসে বললে,—আপনার ছেলেটার ঈষৎ পদস্খলন হয়েছে অর্থাৎ মদ খাচ্ছে। পণ্ডিত নিরীহ গোবেচারা, বললে,—আমি তো কিছুই জানিনে বাবা। পাড়ার লোকটি বললে, বাড়ী ফিরলে আজই দেখবেন তার চোখ জবাফুলের মতো রাঙা, তাহলেই বুঝবেন মদ খেয়েছে, অমনি আচ্ছা করে বকে দেবেন, যেন আর এমন কাজটি না করে। ছেলে বাড়ী ফিরলে পণ্ডিতমশাই তার অবস্থাটা বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একেবারে যারপরনাই হ'য়ে ব'লে উঠল, —ব্যাটাছেলে! পাষণ্ড বেরও বাড়ী থেকে। মদ খেয়েছো? ছেলে জোর অস্বীকার করায় পণ্ডিতমশাই বললেন – নিশ্চয় মদ খেয়েছো, নইলে চোখ অমন জবাফুলের মতো রাঙা কেন? ছেলে তখন কি বোকা বো হয়ে বললে, মদ-টদ নয় বাবা, আমি ভুলে খানিকটা সিঁদুর খেয়ে ফেলেছিলুম তাই চোখ লাল হয়েছে।

আমি হো হো করে হেসে উঠলুম, শরৎদাও হাসতে লাগলেন। এই রকম গল্প করতে শরৎদা অদ্বিতীয় ছিলেন।

শরৎদা বললেন, "কত রকম যে দেখলুম ভাই। আজ আমার ব্রহ্মার এক মাতাল বন্ধুর গল্প মনে পড়ছে, শুনবে?" আমি সাগ্রহেই সম্মতি জানালুম। তখন মাতালের অদ্বিতীয় কথাশিল্পী তাঁর ব্রহ্মার সেই বন্ধুটির যে গল্প ফেঁদে বসলেন, তাতে আমি ভুলে গেলুম রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে এবং আবার শিবপুর থেকে হাওড়ার পোলের কাছে এসে পড়েছি, কিন্তু বক্তা ও শ্রোতা সে সম্বন্ধে উদাসীন। সেদিন শরৎচন্দ্র আমাকে যে সব গল্প বলেছিলেন তার মধ্যে একটা বলছি।

ব্রহ্মার অবস্থান কালে তাঁকে নানান্ অবস্থা এবং লোকচরিত্রের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হতে হয়েছিল। নিজে ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র তাই পরের দুঃখে তিনি বিগলিত হতেন এবং চেষ্টা করতেন তাঁর সাধ্যমত সাহায্য করতে। একবার ঘটনাচক্রে এক ব্রহ্মির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ হয়। ক্রমে সেটা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ব্রহ্মিটা ছিল ভয়ানক মাতাল ও বেপরোয়া। দিবারাত্রি মদ খেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করত, আবার মাঝে

মাকে স্ত্রী কন্যাকে কিছু না বলে ঘরে পড়ত, কিছুদিন তার আর পাত্তাই মিলত না। শরৎচন্দ্রের কাছে স্ত্রীটি কান্নাকাটি করে পড়ত তার স্বামীকে ধরে নিয়ে আসবার জন্য। শরৎচন্দ্র ঘুরে-ঘুরে হয়রাণ হ'য়ে তাকে খুঁজে নিয়ে আসতেন। একবার লোকটা নিরুদ্দেশ হোল। দাদা তো খোঁজ নিয়ে আবার তাকে আনতে ছুটলেন। এবার তাঁর ভয়ানক অভিজ্ঞতা হ'লো। বহু বস্তিতে খুঁজতে খুঁজতে দাদা গিয়ে পড়লেন এক ভয়ঙ্করা স্মাগ্‌লারের (Smuggler) পাড়ায়, যার উপর পুলিসের ছিলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পাড়াটার বাড়ীগুলো যেমন অন্ধকার তেমনি রাস্তা ঘাট দুর্গন্ধ অপরিচ্ছন্ন, ঢুকলেই ঘুষি আসে। শরৎচন্দ্র সে পাড়ায় ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে বাড়ীটা বের করবার চেষ্টা করতেই কতক-গুলি গুণ্ডাগোছের লোক তাঁকে অত্যন্ত সন্দেহ করে রুক্ষ হয়ে সে স্থান ত্যাগ করতে বলে বললে, যদি না যাবে-যাবে বিপদ হও তো ফল বড় খারাপ হবে। শরৎচন্দ্র তখন তাদের তোয়াজ করতে লাগলেন, তাঁর আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য বলে। তখন তারা ঠাণ্ডা হয়ে তাঁকে একটি বাড়ীর কথা বলে বললে যে, সেখানে গেলে বহুর খোঁজ পেলেও পেতে পারে। শরৎদা হাসতে হাসতে বললেন—"তার ঠিকানা পেয়ে তো সেই গোলকধাঁধার মতো বাড়ী যাব বহুমুখ। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য ক'রে বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখি সেই বাড়ীতে অনবরতই লোক ঢুকছে আর কিছুক্ষণ পরে টলতে টলতে বেরিয়ে এসে চলে যাচ্ছে। কী ব্যাপার জানতে কৌতূহল হলো, ভয়ে ভয়ে ঢুকলুম সেই বাড়ীতে। দেখি একটা নোংরা অন্ধকার ল্যাম্প জ্বালা ঘর, কোণের দিকে একটা খাটিয়ায় কতকগুলি লোক শুয়ে, আর সারবন্দীভাবে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে। ভালো করে দেখলুম, দু'জন লোক খাটিয়ে বসে আছে কি সব নিয়ে, একজন করে লোক তাদের কাছে গিয়ে হাঁটুর অনেক উপরে পাজামা তুলে ধরছে আর তারা কি একটা ইন্‌জেকশনের মতো দিচ্ছে, তার পরেই দেখি লোকটা কুঁজো হ'য়ে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, বুঝলুম কোকেনের ইন্‌জেকশন্। উঃ, ব্যাটারা কি নেশাই করতে পারে! সেই নরক কুণ্ড থেকে বহুকে এনে তার স্ত্রীর জীমায় দিয়ে এলুম। কম নাকাল হয়েছি তার জন্যে!

এইরকম নানান বিষয় নেশার প্রতি-ক্রিয়া হলো। সেই বস্তুটির বুকের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় সে শয্যাগত হলো। ডাক্তার স্পষ্টই তাকে দেখে বলে গেল যে, আবার এর উপর যদি সে নেশা করে তবে তাকে বাঁচানো অসম্ভব হবে। স্ত্রী এসে দাদার কাছে কেঁদে পড়ে সব বললে এবং মিনতি জানালে যেন তার দুর্দান্ত বহুদের সংস্পর্শে দাদা যেন তার স্বামীকে যেতে না দেয়। শরৎদা লোকটির অনেক চোখ রাঙানি, অনেক গালাগালি খেয়েও তাকে একটুও নেশা করবার অনুমতি দেন নি, ডাক্তারের কথা স্মরণ করে। এই

—রূপসুন্দা

মাঘ ১৩৪৪

ভাবে খাবার পাহারায় ও তত্ত্বাবধানে লোকটি একরকম মেতে উঠল। শরৎদা বলতে লাগলেন, সেদিন রাত্রে তার বাড়ী থেকে ফিরে গিয়ে খেতে বসেছি, এমন সময় দরজায় অনেক শিকল নাড়ার শব্দ। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দেখলুম, সেই বন্ধুর বাড়ীর চাকর। কি ব্যাপার? চাকরটা বললে যে, আমি চলে আসবার পরই বাবুর কয়েকটি বন্ধু আসে এবং বাবু নীচের ঘরে তাকে রাজি করিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করতে যায়। তারা বাবুর সামনেই মদ খেতে আরম্ভ করে, বাবুও তাদের হাতে পায়ে ধরে একটু মদ চায় ও বলে যে সে এখন ভালো হয়ে গেছে সুতরাং মদ একটু খেলে কিছুই হবে না। তারা মদ দিতেই বাবু এক চুমুক খেই খেয়েছে অমনি খাঁ-খাঁ-বলে বিকট শব্দ করে পড়ে গিয়েই মারা গেলেন। বন্ধুরা সবাই পালিয়েছে। যাই হোক, সেই চাকরটার সঙ্গে তখনই গেলুম। স্ত্রী এসে কাঁদতে কাঁদতে বললে যে তারই বুদ্ধির দোষে তার স্বামী মারা গেলো, কেন সে বিশ্বাস ক'রে বন্ধুদের কাছে যেতে দিয়েছিল। সেই এক মাতালের শোচনীয় পরিণাম দেখেছিলুম।

সেদিন রাত্রে শরৎদার মুখে যে সব গল্প শুনেছিলুম তাতে বার বার মনে হচ্ছিল, কী অদ্ভুত, কী বিচিত্র এই লোকটির জীবনের কাহিনী—আর সে গল্প মুখে এমন হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করারও কী প্রতিভা! আমার যেন মনে আছে সেদিন সারা রাত্রি আমাদের এমনি করে কেটে গেলো। পরস্পর ছাড়াছাড়ি হলো সকাল বেলা একটা দোকানে চা খাবার পর।

তারপর আরো অনেকদিন দু'জনে এমনি ক'রে দিন কাটিয়েছি। তাঁর রসিকতা, তাঁর জীবনের প্রকৃত ঘটনা সবই শোনবার সুযোগ হয়েছিল তখন। সেই সব জীবনের নিজের অভিজ্ঞতার কথা যখন তিনি বলতেন তখন সব কিছু ভুলে যেতুম। তিনি বর্মায় অনেক গল্পই আমাকে একটি একটি করে বলেছিলেন। তার মধ্যে যে গল্পটা সবচেয়ে বীভৎস ও করুণ তা হচ্ছে বর্মার প্লেগের গল্প। দীর্ঘ সময় নিয়ে প্লেগের সময় তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল, মৃত্যুর কী তাণ্ডবলীলা তিনি দেখেছিলেন—সেখানকার মৃত্যুতীত নরনারীর কী অবস্থা তখন হয়েছিল, তা একটি একটি করে আমার কাছে গল্প করেছিলেন। "শ্রীকান্ত" দ্বিতীয় পর্ব যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে এর বর্ণনা বাহুল্য। আমি তাঁর মুখেই শুনেছি এ সমস্তই তাঁর চোখে দেখা বর্মার ঘটনা, যা তিনি দ্বিতীয় পর্বে লিখেছেন। প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্তীর কথাও তিনি আমার কাছে গল্প করেছেন, তবে তার আসল নাম না দিয়ে মনোহর চক্রবর্তী নাম দিয়েছেন—এটা খুব সত্য ঘটনা। জাহাজের ঝড়ের যে বর্ণনা, তা তাঁর জীবনেই ঘটেছিল। মদ, টগর, অন্যান্য সব সহযাত্রী যাদের তিনি তাঁর কলমে অমর করে রেখে গেছেন, তাঁদের সবাইকে তিনি দেখেছিলেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করে-

ছিলুম,—আচ্ছা তোমার সব চরিত্রই কি তোমার নিজের চোখে দেখা? শরৎচন্দ্র বলেছিলেন,—নিছক কল্পনা কোনো চরিত্রই নয়। প্রত্যেক চরিত্রটার বাস্তব-ভিত্তি আছে। জীবানন্দকেও তিনি জীবনে দেখেছেন।

কি জিনিষটা মনে নেই, কোনো এক কাগজে সেবার তাঁর সাহিত্য প্রতিভার উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদ করে। সেই কাগজখানা পড়ে আমি তাঁকে এই কথা বলেছিলুম। তাতে তিনি বলেছিলেন, সাহিত্য-সেবা করে পাঁচুর মার কাছ থেকে সেদিন যে কমপ্লিমেণ্ট পেয়েছিলুম, তা শুনলে এসব তোমার তুচ্ছ মনে হবে।

আমি বললুম, শুনিনা, তোমার পাঁচুর মা কি কমপ্লিমেণ্ট দিয়েছিল।

শরৎচন্দ্র যে গল্প ক'রেছিলেন আজও আমার তা মনে আছে। আমার মনে হয় এর চেয়ে সাহিত্য সেবার বড় পুরস্কার তিনি পান নি। গল্পটা এই—

একদিন শরৎচন্দ্র মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক দোতলা বাড়ীর বারান্দা থেকে 'দা-ঠাকুর, ও দা-ঠাকুর চীৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেখলেন তাঁরই পরিচিত একটি লোক তাঁকে ডাকছে। লোকটা ব্রহ্মাক্ষ বাদা বেচত, কোন সূত্রে তার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। এ বাড়ীতেই তার দোকান এবং এইখানেই সে স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে থাকত। শরৎচন্দ্র দু'চারবার তার দোকানেও গেছেন। সেদিন লোকটির ব্যগ্র আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি গেলেন। গিয়ে দেখেন স্বামী-স্ত্রীর তুমুল বিবাদ, দুজনেই শরৎচন্দ্রকে প্রথম জিনিষটার মীমাংসা করতে। ব্যাপারটা কিছুই নয়, ব্রহ্মাক্ষের দোকানদারের রোখ চেপেছে তার মেয়ে পাঁচুকে স্কুলে ভর্তি করে ইংরাজী শেখাবেই, কিন্তু তার স্ত্রীর প্রবল আপত্তি। এই নিয়ে প্রবল বাকবিতণ্ডা এবং দা-ঠাকুর শরৎচন্দ্রকে ধরে মীমাংসার চেষ্টা। শরৎচন্দ্র বললেন —"তা পাঁচুর মা, মেয়েকে স্কুলে পড়াতে কী আপত্তি?" তাতে পাঁচুর মা বলেছিল, আপত্তি কি? তুমি দাদা বুদ্ধিমান হয়ে এ কেমন কথা বলছ! আমি জেনে শুনে আমার মেয়েকে ভদ্দর লোকের মেয়ের স্কুলে দিতে পারি? পাঁচু আমার মেয়ে জানলে, ওরা পাঁচুকে ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেনি। একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড বাধবেনি? তা বিনসে কিছুতেই শুনবেনি দা-ঠাকুর। আরে বাপু ও' এ্যারেজী শিখে করবে কি? ও তত ম্যাজিষ্টর হবে, না চাকরী করবে? বিনসে বলে কি জানো দা-ঠাকুর, এ বাজারে এ্যারেজী না শিখলে চলবে নি। কেরদে বাপু, ও মেয়েমানুষ যে ঘা'ই যদি ওকে কেউ না করে, কাজকম্মও যদি না জোটে, তাহলেই বা ভাবনা কি? দুয়ত্তর বাঙলাও তো লিখতে জানে।—কিছু না পারে এই দা-ঠাকুরের মতো দু'খানা বই লিখেও তো পেট চালাতে পারবে, তা তো আর ওকে কেউ ঘোচাবনা। কি বল দা-ঠাকুর?

—রূপনারা

মাঘ ১৩৪৪

আমি হেসে উঠলুম। শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, "কি রকম কমপ্লিমেন্ট! কি বল ভূপেন?"

২

যাকে শিবপুরে যাত্রা উপলক্ষে শরৎচন্দ্র গেলেন রূপনারায়ণের তীরে তাঁর নব নির্মিত বাড়ীতে, সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গেও তাঁর দেখাশুনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। এতোদিনের বন্ধুত্ব, এত অন্তরঙ্গতা, সবই বুঝি আমরা ভুলে গেলুম জীবনের নানা পরিবর্তনের মধ্যে এসে। তাঁর সঙ্গে বছরের পর বছর আর দেখাই হতো না। আমি নাটক রচনায় এবং অন্যান্য অপরিহার্য কাজের ব্যস্ততায় তাঁর কাছে যেতে পারতুম না, তিনিও তাই। এমনি করে পাঁচটি বছর কেটে গেলো, দুজনে দেখা নাই। তবু কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে পুরণো দিনের কথা আমার মনে পড়ত কিন্তু আমার সন্দেহ হতো নানা পরিবর্তনের জন্যে আমাদের সে সবদিনের কথা হয়তো শরৎচন্দ্রের আর তেমনি মনে নেই—তা থাকাই স্বাভাবিক।

আমাদের পাড়ার কিসের একটা Social gathering—ছেলেরা আমাকে এসে বললে, "শরৎচন্দ্রকে আপনি একটা চিঠি দিন, আমাদের এখানে সভাপতিত্ব করবার প্রস্তাব করে।" উপায় নেই,—কিছু দীর্ঘকাল পরে প্রথম যৌবনের মিত্যসহচর শরৎচন্দ্রকে একটিচিঠি। সেই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি। দু'দিন বাদেই এই উত্তর এলো তাঁর কাছ থেকে—

দামতাবেড়, পাণিত্রাস,
হাবড়া।

ভাই ভূপেন, তোমার চিঠিখানা প'ড়ে কতদিনের কত কথাই না মনে পড়ল,—কিন্তু সে সব তো আর চিঠিতে লেখবার নয়। আমিও এদিকে বজ্জাতি ক'রেই টিকে আছি—যাবার নামটি নেই। সেদিন ছিলুম আমরা যৌবনের কোঠায় যৌবনের নানা আনন্দ ও অনাচার নিয়ে, আর আজ বড়ত্তে চড়তে গেলেও মনে হয় থাকলে আজ,—কাল দেখা যাবে। অতএব শরৎদার উপদেশ সেদিনের সঙ্গে এদিনের মাঝে মাঝে একটু তুলনা করে দেখো, আমোদ পাবে।

চিঠির জবাব দিচ্ছি বলে আশ্চর্য্য হয়ো না। শতকরা নব্বুইটা চিঠিই আমার নিরুত্তরে থেকে যায়, কিন্তু বাকী দশটার মধ্যে যাঁরা আজও আছেন তাঁদের একজন তুমি। ভাই।

তোমার লেখবার আমি কিন্তুই নিলুম কিন্তু এই রবিবারেই কলকাতার কোনো হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হতে যাচ্ছি,—যাওয়া অনেক পরে হয়না ভাই? কত খুসির সঙ্গেই যে তোমার ওখানে যেতুম তা বলতে পারিনে।

তোমার ছেলেটি আমাকে অ্যাঠামশাই বলে ডাকে এবং শিষ্যের মতই ভক্তি শ্রদ্ধা করে এ কথা ঠিক তোমার মতোই জানি। বলবার প্রয়োজন নেই।

—শরৎ সংখ্যা
ফাল্গুন

তাদের সকলকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিয়ো এবং তুমিও জেনো তোমার পুরানো বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ। ইতি—

৯ই কার্ত্তিক ১৩৪০ তোমাদের—

শরৎদা

এরপর আমার পুত্র হীরেন্দ্র তাঁর কাছে যাতায়াত আরম্ভ করলে এবং অল্প দিনেই শরৎচন্দ্রের স্নেহের পাত্র হয়ে উঠল। তার মুখেই শুনতুম, শরৎচন্দ্র কত উৎসুক হয়ে আমার সংবাদ নিতেন, আমাদের পুরোনো দিনের কত কথা আনন্দের সঙ্গে বলতেন তার কাছে, আমাকে নিয়ে কত রসিকতা করতেন। শুনে মনে হতো শরৎচন্দ্র প্রথম অখ্যাত দিনের বন্ধুকে আজও ভোলেন নি, আজও একটু স্নেহও অবশিষ্ট আছে তাঁর পুরোনো বন্ধুটির জন্যে। শুনেছি তিনি অনেক জায়গায় যাবার সম্মতি দিয়েও যেতেন না কিন্তু হীরেন্দ্র পাঁচ-ছবার তাঁকে আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছে, কখনো তিনি নিমন্ত্রণ অবহেলা করেন নি। প্রতিবার খুসি হয়ে এসেছেন ও দীর্ঘসময় কাটিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে সেই রাত্রি বাড়ী ফিরেছেন। একদিন এমনও হয়েছে, তিনি না বলে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছেন আমার বাড়ী। মৃত্যুর দেড়বছর আগে আমার বাড়ীতে সেই আমার তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। সেই দিনের কয়েকটি কথা আমার মনে পড়ে।

ইদানীং তাঁর একটা কথাই হয়েছিল, আমার আর বেশীদিন নয়। সেদিন নানান্ কথার পর বললেন, আর কি—এবার শরৎ সন্ধ্যা—

দুপ্ ঘাট

যাবার সময় হয়ে এলো—অনেকদিন বাঁচলুম, কি বলো ভূপেন?

হীরেন তাঁর কথার উত্তরে বললে, কতদিন আর বেঁচেছেন—ষাট বছর আবার একটা বয়েস নাকি? আপনি এখনও অনেকদিন বাঁচুন, এই কামনাই করি।

কথা শুনে শরৎচন্দ্র হাসতে লাগলেন, আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে বললেন, তুমি বলো কি হীরেন? তোমাদের কাছে আমি তো বাতিল হয়ে গেছি। তবে এখনও কম বয়েস বটে আমার এই ভূপেন টুপেনের কাছে—তারা ষাট বছর বয়েসটাকে নিতান্ত কম মনে করে—তাদেরও ষাট হয়ে এসেছে কি না। এই বয়সে কেউ মরেছে শুনলে বলবে, আহা। এত কম বয়েসে গেল গা। ভূপেন, হীরেনের কাছে গোঁপে কলপ-টলপ দিয়ে যতই বয়েস কম বলে চালাও না কেন, তুমি আমায় চেয়ে দু'তিন বছরের বেশি ছোট নও। হীরেন তোমার বাবাকে বেশি কম বয়েস ব'লে মনে ক'রো না। বলে শরৎচন্দ্রের সে কী প্রাণখোলা হাসি।

সেদিন বিদায় নেবার কিছুক্ষণ আগে শরৎচন্দ্র বললেন, অনেকদিন বেঁচেছি ভাই, আর কেন। আমি কখনো নিজেই কল্পনা করতে পারিনি যে এতদিন বাঁচব। আমি যে ভাবে জীবন যাপন করেছি তাতে এতদিন কেউ বাঁচে না। তাই আমার কোন দুঃখ নেই।

আজ শরৎচন্দ্রের মৃত্যুদিন উপলক্ষে সবচেয়ে মনে পড়েছে সেই মানুষটিকে, যিনি পরে রসিকতার হাসিতে প্রাণপ্রাচুর্য্যে

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

আমাদের মনে তাঁর চিরস্থায়ী আসন করে গেলেন। বাইরে থেকে মানুষ চিরদিন তাঁর সাহিত্য প্রতিভাকেই পূজা করবে কিন্তু তারা জানবে না, কত বড় মহাশিল্পি মানুষ ছিলেন শরৎচন্দ্র, কতখানি খাঁটি বাঙালী ছিলেন শরৎচন্দ্র। শত শত বছর এক অন্তরাত্মা খাঁটি বাঙালীর মহাশিল্পের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ নিদর্শন মহামনীষি শরৎচন্দ্রের নশ্বর দেহ চিতানলে ভস্মিভূত হ'লো। মানুষটির সঙ্গে বাংলার যে জিনিষ গেলো আর কখনো তা ফিরে আসবে না। আজ তাই দুর্লভ মানুষটির স্মৃতির উদ্দেশে আমার বিনম্র নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই আচার পরায়ণ ব্রাহ্মণের এই ধর্ম্ম কোন্ সত্যকার ধর্ম্ম, যাহা সামান্য একটা মেয়ের প্রতারণায় এক নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল, যে ধর্ম্ম অত্যাচারীর আঘাত হইতে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরং তাহাকেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম্ম, এবং মানব জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা কোনখানে? যে ধর্ম্ম স্নেহের মর্য্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় আর্ত্তনারীকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যাইতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিল না, আঘাত খাইয়া যে ধর্ম্ম এত বড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল, প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম্ম? ইহাকে যে স্বীকার করিয়াছে সে কোন্ সত্য বস্তু বহন করিতেছে? যাহা ধর্ম্ম, তাহা ত বর্ম্মের মত আঘাত সহিবার জন্যই! সেই ত তার শেষ পরীক্ষা।—গৃহদাহ

সংসারে সকল বড় কার্য্যই কাহারও না কাহারও ক্ষতিকর হয়, যাঁহারা এই কার্য্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনেকের মঙ্গলের জন্য সামান্য ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর পান না। সেইজন্য অনেক স্থলেই তাঁহারা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বলিয়া জগতে প্রচারিত হন।—দত্তা

রূপলেখা— —শরৎ সংখ্যা

মাঘ ১৩৪৪ মূল্য একষট্টি

শরৎচন্দ্র

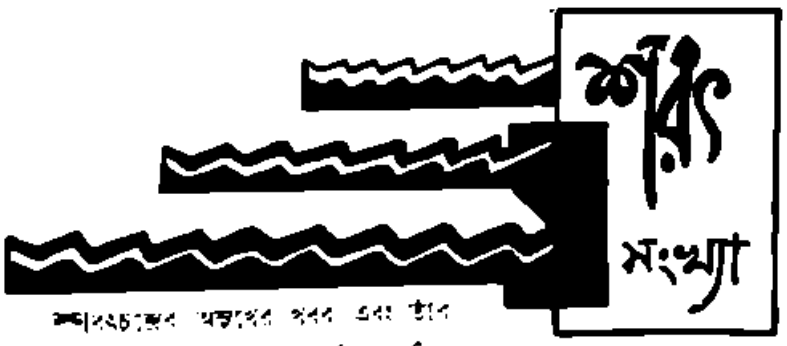

শরৎচন্দ্রের অন্তরের পরশ এবং তাঁর সৃষ্টি মনের উপর নিয়ে ঠিক একটি কড়ের দৈনিক আজ প্রায় ৪'মাস তাঁর অন্তর, নাসিং হোমের প্রতিদিনকার সংবাদ আশায় আশায় দেখতে একদিন শেষে গেল তিনি নেই তারপর খবরের কাগজে বাংলা দেশ জুড়ে শোকসভার বিবরণ পড়ছি; আজকাল শোক-সভা বাংলাদেশের সীমা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ ছুটে চলে তাঁরই মানুষের সমাজে, মানুষের মনে বেঁচে থাকার একটি প্রত্যক্ষ স্পষ্ট রূপ ছোট বেলা থেকে 'মরিয়া অমর' হ'লে যে একটি কথা শুনে আসছি, সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। সংসার থেকে তাঁর বিদায় নেবার পর তাঁর সমস্ত সাহিত্য-কীর্তির অমরতা স্মরণ ক'রেও মন কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে, তিনি নেই।

সাহিত্য বাঙালীর বড় গৌরবের বস্তু। যাঁদের বড় অভাব, তারাও সাহিত্যের কথায় কান দেয়—শুনে বুঝবার চেষ্টা করে। 'আজকাল কে কে ভালো লেখেন?' বাঙালীরই মনে মনে আছে। সময় ও সুবিধা হ'লে নিতান্ত জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষও এ প্রশ্ন করে। এই অতি সাধারণ প্রশ্নের যে উত্তর হয়, সেই উত্তরে আমরা যাঁর যাঁর নাম করি, "শরৎচন্দ্র" তাঁদের মধ্যে একজন। এঁরা আমাদের কাছে প্রাতঃ-স্মরণীয়। এমন একটা দিনও যায় না, যেদিন তাঁদের নাম না হয়। প্রতিদিন কথাপ্রসঙ্গে এঁদের নাম হয়, আমাদের বিশেষ নির্জন ভাবনার অবকাশে আমরা এঁদের কথা মনে করি, জাতির পুব একটা বড় গৌরব এঁদের নামের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনুভব করি। শরৎচন্দ্রের দেহাবসানের পর, তাঁর নামটি মনে হলেই এই কথাই সর্বাগ্রে মনে হয়, যে তিনি নেই—তাঁকে জীবদ্দশায় আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

তাঁর জীবদ্দশায় জাতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধানিবেদন তাঁর জয়ন্তী উৎসব হয়েছে।

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

তাঁর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-যাপনের কথা, তাঁর সম্বন্ধে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনা, তিনি কখন লেখেন, কি ভাবে লেখেন, উপন্যাস লিখবার আগে ছক্ করে নেন কি না, তাঁর হেলি ফুজুরের কথা, তাঁর প্রবাস জীবনের কথা, দেশ ভাবার কথা, —যিনি যেমন জানেন তিনি তেমন ব্যাখ্যা ক'রেছেন। তাঁর সাহিত্য-কীর্ত্তি নিয়েও অনেক গভীর এবং গভীরতর আলোচনাও হ'য়েছে। মোট কথা, এই মনে হয় যে, তিনি তাঁর প্রাপ্য—মানুষের শ্রদ্ধায় এবং শ্রদ্ধানিবেদনের যতটুকু সীমা আছে, ততটুকু পেয়েছেন। এর বেশী হয় ত আমাদের দেশে আর সম্ভব হয় না। তাঁর মৃত্যুর পরেও যে দু'একটি উদ্বেগ-বোধ্য লেখা চোখে পড়েছে, তা'তে শোক গভীর হৃদয়ের বেদনার দিকটাই লক্ষ্য করেছি। সাধারণত যা হওয়া উচিত যা' হয়ে থাকে,—এ ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটে নি। দেশবাসী তাঁকে এবং তাঁর রচনাকে ভালোবেসেছেন, তাঁর লেখাকে তাঁরা নিজেদের প্রতিদিনকার সুখ-দুঃখের মধ্যে একান্ত প্রাণের সামগ্রী হিসেবে নিয়েছেন—তাই তাঁর সম্বন্ধে দেশবাসীর কোনো কর্ত্তব্যের ত্রুটী ঘটে নি।

তাঁর মৃত্যুর পরই আমার প্রীতিভাজন 'রামধনু' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য আমাকে একটি কবিতা লিখতে অনুরোধ জানান। "শরৎবিয়োগ" নাম দিয়ে কবিতা লিখবার চেষ্টা করলাম, কবিতা হৃদয়ের হৃদ মিল না। সুতরাং সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ভাবলাম, যদি কিছু লিখি, তা গদ্যের আকারে লিখব। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর জয়ন্তী উৎসবে তাঁর জীবদ্দশায় কবিতা লিখে শ্রদ্ধায় অর্ঘ্য, তাঁর উদ্দেশে সমর্পণ করেছি। তাঁর দেহান্তে কবিতা লিখতে গেলে হয়ত ঠিক সেই কথারই পুনরাবৃত্তি হ'বে, এই আশঙ্কায় কবিতার দিক্ দিয়ে আর গেলাম না। কি লিখব? অনেকে অনেক কিছু লিখেছেন, আমার বলবার কি আছে, এই ভাবছি এমন সময় মাসিক পত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে যা' হোক্ কিছু লিখবার তাগিদ এলো। এই সুযোগে মনে মনে যা ভাবছি আজ অনেকদিন ধরে, সেটা প্রকাশ করার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে মনে করে নিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কবি বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তুমি কিছু লিখলে?' প্রেমেন্দ্র বললেন, 'হাঁ, আমি একটা কবিতা লিখেছি; প্রবন্ধ পরে লিখব।' বললাম, 'কবিতা তুমি কি লিখলে?' প্রেমেন্দ্র বললেন, 'যা' ভাবলাম, সেটা কবিতাতেই লেখা হল।' আমি মনে মনে ভাবলাম, 'বোধ হয় অনুভূতির তীব্রতা বেশী।' হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে প্রেমেন্দ্র শরৎচন্দ্রের খানিটা অবসর হতে পেরেছিলেন। আমার এ অনুমান হয়ত অন্যান্য মাও হতে পারে—কে কি ভাবে, কোন্ অবস্থায় ভাবেন, তারই উপরে বোধ হয় এটা বেশী নির্ভর করে।

—শরৎ সংখ্যা

রূপলেখা—

মাঘ ১৩৪৯

দুশ তেইশ

তখন ইস্কুলে পড়ি। আমরা তখন যাকে ফোর্থ ক্লাস বলতাম, এখন সেটা ক্লাস সেভেন্। আমি তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। একদিন ইস্কুলে যাবার ঠিক আগে আমার নামে একটা খুক্ পোষ্ট এলো। সেটা সাগ্রহে খুলে দেখি, একখানি ছোট বই—তার নাম 'পল্লীসমাজ'। লেখকের নাম—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যিনি বইখানি পাঠিয়েছেন, তিনি বইএর মলাটের নীচে-কার সাদা কাগজে লিখেছেন, "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এই বইএর রমেশের মত হও।" বড় আনন্দ হল বইখানি পেয়ে—পকেটে ক'রে লেখানা ইস্কুলে নিয়ে গিয়েছিলাম কি না মনে নেই। তবে সেখানি শেষ করতে বেশী সময় লাগে নি। ছোট ছোট অক্ষরে ঠাসবুনানি ছাপা—ছোট সাইজ; আট আনা সংস্করণের 'পল্লীসমাজ'। ছোট বয়সের স্বল্প এবং আগ্রহ নিয়ে বইখানি পড়ে ফেলেছিলাম। তাতে ম্যালেরিয়ার কথা, পল্লীসংস্কারের কথা, রমেশ এবং রমার কথা, ছোটখাট অনেক সুখদুঃখের কথা—সে সব তখন অধীর আগ্রহে পড়েছি। সেই হতে রমেশের মত হওয়ার ইচ্ছা মনের গোপন কোণে সযত্নে লালন করেছি—হতে পেরেছি কিনা সে কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু একটা আদর্শ যে শরৎচন্দ্র বাঙালীর চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন, সেটা নিঃসন্দেহ। যে আদর্শের উদ্ভাসিত আভাসে আমার প্রথম-স্পর্শ ছোটবাবা বইখানি কিনে তাঁর শরৎ সন্ধ্যে—

দুশ চুয়াত্তি

ছোট ভাইকে উপহার দিয়েছিলেন,—আমাদের ভাবপ্রবণ মনে, শরৎচন্দ্রের আর যতদিন্ দিয়েই প্রতিষ্ঠা হোক্, এই মহত্তর জীবনের স্বপ্ন তিনি দেখে গিয়েছেন, এই দিক্ থেকেই জাতির সাহিত্য-চরিতা হিসেবে তাঁর সাদর আহ্বান রয়েছে মানুষের মধ্যে।

তার কয়েক বৎসর পরে ইস্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার হলে একদিন দেখলাম প্রশ্ন রয়েছে,—শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য কোথায়, নিজ ভাষায় বল। 'পল্লীসমাজ' পড়ার পর খুঁজে খুঁজে তাঁর আরও অনেক বই পড়ে ফেলেছিলাম। রাবের যুবতি, বিন্দুর ছেলে, বেজদিদি, পরিণীতা, অরক্ষণীয়া প্রভৃতি অনেক বই পড়েছিলাম। সুতরাং প্রশ্নের উত্তরে কি লিখেছিলাম, হয়ত ঠিক মনে পড়ছে না; তবে আজ এই কথাই মনে হয় যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সে হয়ত দ্বিতীয় যুগ, সেই সময়েই তিনি এতদূর মানুষের মনের তারে তারে আঘাত দিতে পেরেছিলেন, যে, পরীক্ষার পাঠ্য হিসেবে তাঁর বই নির্ব্বাচিত না হলেও প্রশ্নপত্রে তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার প্রশ্ন ছিল। সেখানে শিক্ষক মহাশয় যিনি প্রশ্নকর্ত্তা, আর যারা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দেবে, তাঁরা সকলেই শরৎচন্দ্রের মুগ্ধ পাঠক, একথা মেনে নিতেই হবে।

সেই সময় থেকে এ পর্য্যন্ত প্রায় ষোল-সতের বৎসরের কথা—এর মধ্যে প্রায়

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

প্রতিদিন কোনো-না-কোনো বিষয়ে শরৎ-চন্দ্রের কথা ভেবেছি' বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে বিতর্কে, নির্জনে, ভাবনার অন্ত বই পড়তে পড়তে প্রায়ই তাঁর কথা হয়েছে। তখন "শ্রীকান্ত"—প্রথম পর্বের যুগ। ইন্দ্রনাথ আর সঙ্গী শ্রীকান্ত, নিশীথ অভিযান, 'ছিনাথ বউরূপী'—এসব পড়তে পড়তে আমাদের নিজেদের কথাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, —আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা পড়ছি। আয়নায় মুখ দেখতে যেমন মনে হয় ঠিক তেমনই মনে হ'ত। তিনি তখন আমাদের কিশোর-হৃদয় ছুঁড়ে বিরাজ করতে লাগলেন। তারপর ক্রমশঃ তাঁর অন্য বইগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগলো। আমরা তখন ইস্কুল শেষ করে কলেজে এসেছি। 'চরিত্রহীন' 'গৃহদাহ' আমাদের তখন আলোচ্য হ'য়ে উঠল। এই সময়ে কোনো মাসিক পত্রিকায় বোধ হয় তাঁর প্রথম ছবি দেখলাম। একমুখ দাড়ি, অতি সাধারণ বেশ-ভূষা। এই সময়ে শুনলাম, শরৎবাবু নন্-কো-অপারেশনে যোগ দিয়েছেন। ছবি দেখবার পর থেকেই মানুষটিকে দেখবার প্রবল ইচ্ছা হ'তে লাগল। কোনো সুযোগ নেই। যদি কোনোদিন তিনি তাঁর পাড়াগাঁর বাড়ী থেকে কোনো সভা-সমিতি উপলক্ষ্যে কলকাতায় আসেন, তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সেই সময় কবি সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের মৃত্যু হয়েছে। কলকাতার নানাস্থানে সভাসমিতি ও শোক প্রকাশ চলছে। শুনলাম, শরৎবাবু একটি সভার সভাপতি হবেন। আমরা দল বেঁধে সেই সভায় গেলাম। বিওপকিন্যাল সোসাইটির উপরের হলে সভা। সভায় লোক-সমাগম বেশ হয়েছে দেখলাম। তখনো শরৎবাবু আসেন নি। সেজন্য চাদর গায়ে দিয়ে মজরুল ইসলাম 'বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে, এই গজার ফুলে' গানখানি গাইলেন। এমন সময় শরৎবাবু এলেন। তখনকার তাঁর চেহারাটি আমার ঠিক মনে নেই। সত্যেন্দ্র বিয়োগে তিনি বিশেষ কিছু বললেন না, 'সত্যেন কবি ছিল, খুব ভালো কবি'—এই ব'লে আরম্ভ করে অতি সংক্ষেপে তিনি শেষ করলেন। তাঁর বলবার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল, তাঁকে যেন জোর ক'রে সভায় আনা হয়েছে। মনে হ'ল, সভাসমিতিতে তিনি বেশ একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েন। সেই সভায় সত্যেন্দ্র নাথ সম্বন্ধে অনেক কথা, অনেক সংবাদ, চারুচন্দ্র বলেছিলেন, এইটাই মনে আছে। যা' হো'ক, শরৎচন্দ্রকে এই প্রথম দেখলাম। যিনি এত সুন্দর লেখেন তিনি সভায় ভালো বলতে জানেন না'—এই ধারণা নিয়ে ফিরে এলাম

তারপরে আর কোথাও তাঁকে চাক্ষুষ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আলোচনা আমার প্রতিদিনই হয় মনে মনে। বই-ও পড়ি। নিজের লেখা সাহিত্য-চর্চ্চাও চলে। এইভাবে প্রায় দশ এগারো বৎসর কেটে গেল এর মধ্যে তাঁর জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন হল। হুঁহার বেশ লোরগোল করে শরৎ-জয়ন্তী হ'ল। এই সময়ে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বেশ

—শরৎ সংখ্যা।

সাড়া পড়ে গেল দেশ জুড়ে। এই জন্মন্তী কবিতা লিখলাম। তারই এক লাইন আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে—

'ধূলায় মলিন বীণা কোলে টানি
করিছ সন্ধান
বুঝিতে সুরের বাণী।'

সভায় উপস্থিত হয়ে কবিতা পড়ার সুযোগ পেয়েও এড়িয়ে গেলাম। পলাতক বৃত্তি বোধ হয় একটু বেশী, যাই হোক, আরও একটি কবিতা শরৎ-জন্মন্তীতে লিখলাম তখন শরৎচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের দিক্‌পাল, —সকলের মুখেই 'পথের দাবী'র কথা শুনতে পাওয়া যেত।

সাহিত্য-স্রষ্টার একটি মনোজগৎ এবং মনন জগৎ আছে। সাহিত্য-স্রোতস্বিনীর সেই স্বর্ণ-রেণু কণার সিকতায় দাঁড়িয়ে নিজের মনোজগৎ এবং মননজগতে যখন একাকী, তখন একদিন শুনলাম শরৎচন্দ্র কলকাতায় এসেছেন। কলকাতাতেই তিনি এখন থাকবেন। একলা কোথাও গিয়ে কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করার অভ্যাস আমার নেই একেবারেই। সুযোগ এল। কবি-ভ্রাতা কনকভূষণ মুখোপাধ্যায় একদিন বললেন, 'চলো হেম দা,' শরৎবাবুকে এই দিয়ে প্রণাম করে আসি। হয়ত এ সুযোগ আর হবে না এই মনে করে সমস্ত লজ্জার জাল কাটিয়ে কনকভূষণ আর আমি—আমরা দু'জনে শরৎবাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। এর আগে একদিন কবি-বন্ধু অচিন্ত্যকুমারের মুখে শুনেছিলাম,—শরৎবাবুর শরৎ সংখ্যা—

দুশ জেবলী

পল্লীজীবনের বর্ণনা, তাঁর আদর-আপ্যায়নের কথা অচিন্তকুমার এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন, তা'র একটি লাইন হঠাৎ আজ আমার মনে পড়ছে—

'লাজুক বঙ্কিম নদী দিয়াছে গা-ঢাকা
অর্দ্ধঘুটকেশ।'

অচিন্ত্যকুমারের এই বর্ণনা মনে করে যাত্রা করলাম। কলকাতা সহরে অবশ্য লাজুক বঙ্কিম নদীর দেখা পাওয়া যাবে না—এই যা ভাবলা অনেক খুঁজে খুঁজে শরৎবাবুর বাড়ী বা'র করলাম। বাইরের বারান্দাটি বড় সুন্দর সামনে ছোট বাগান করার মত একটুকরা ভূমি। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছি। আমাদের উত্তরীয় হাতেই রই। শরৎবাবুকে প্রণাম করে এই উপহার দেব—এই ইচ্ছা। তখন সকালবেলা। বাইরের বৈঠকখানা ঘরে তখন কেউ নেই। শুধু শরৎচন্দ্র ঘরে বসে বোধ হয় খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হাতে গড়গড়ার নল। কনক বললে, 'হেমদা' এই সুযোগ, এস প্রণাম ক'রে যাব।' শরৎচন্দ্র আমাদের দেখতে পেয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুখখানি গম্ভীর। আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছ?' আমরা বললাম, এই দিয়ে এসেছি, উপহার দেব ব'লে। শরৎচন্দ্র বললেন, কি বই—কার? আমরা দু'জনেই তাঁকে বই দিয়ে প্রণাম করলাম। বই দিয়ে তিনি বললেন, "এসো তোমরা বসো।" তারপর তাঁর বসবার ঘরের উত্তর দিকের জানালার কাছে চেয়া-

—রূপনারায়ণ

মাঘ ১৩৪৪

রের উপরে বই ক'খানা রেখে সেগুলির নাম ক'রে ক'রে পড়তে লাগলেন। তার-পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দীপান্বিতা—তোমার নাম বোধ হয় হেমচন্দ্র বাগচী, কেমন?' আর কনকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নীলাম্বরী—তোমার নাম কনকভূষণ, তোমাকে আমি আগে দেখেছি বোধ হয়, কেমন না?' তারপরেই তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমার এখন একে-বারেই সময় নেই, তোমরা দু'জনে বিকেলের দিকে এসো—এইদু'টো তিনটের সময়।' আমরা প্রণাম করে বিদায় নিলাম।

তারপরে সেদিন আর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া হয় নি। পরে একদিন শিশু-সাহিত্যলেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নাথ সেন-গুপ্ত সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাড়ী যাই। রবীন্দ্রবাবু তখন 'মোহন বেণু' কাগজ সম্পাদন করতেন। শরৎবাবুর একটি লেখা নেবার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বিকালে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা করার সুবিধা। সুতরাং সেই সময়েই আমরা তাঁর বাড়ী চললাম। তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখি, অনেক লোক—বৈঠকে বসে, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে সব ব'সেছেন। শরৎবাবু নেই। শুনলাম, দুপুরে খানিকটা বিশ্রাম করে তিনি নেমে আসেন। আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি নেমে এলেন। অনেকের সঙ্গে অনেক কথা-বার্তার পর, সন্ধ্যার একটু আগে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার একটু অবকাশ পেলেন। তখন বৈঠকখানার কেউ রইলেন না। রবিবাবু চৌকিতে, আমি পূবদিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা চেয়ারে। আর শরৎচন্দ্র তাঁর আসনে বসলেন। এমন সময় চাকর এসে তাঁর পা-পোষখানি ঝেড়ে মুছে তাঁর পায়ের নীচে রেখে গেল। তিনি তার উপরে পা-দু'খানি রেখে সড়গড়ার নল হাতে নিয়ে একটু হেসে বললেন, 'এতক্ষণ পর তোমাদের সঙ্গে কথা কইবার সময় হল। তাঁর মাথার সাদা চুলগুলির পিছনেই খোলা জানালার ফাঁকে দিয়ে আকাশ আর জানালার গা বেয়ে কি একটা লতার ছোট ছোট আঁকবিঁকগুলো দেখা যাচ্ছিল। বিকালের ম্লান আলো। শরৎচন্দ্র তামাক টানতে টানতে ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগলেন।

'আমার লেখা নেবে? লিখি কম।

তোমার কাগজের নাম—'মোহনবেণু'? আচ্ছা আমি দেখব। কিন্তু ঠিক নেই। আমাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে আমার লেখা একেবারেই হয় না। বাড়ী গিয়ে যা একটু-আধটু লিখি।'

তারপর খানিকটা থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'আচ্ছা, এদের মধ্যে কে ভাল লেখে—অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব? এরা কি করে? শুধু লেখে? লিখে এদের চলে?'

'চাকরী পেয়েছে? বেশ ভালো হয়েছে! এদের মধ্যে প্রেমেন্দ্রকেই শক্তিমান্ বলে মনে হয়। বেশ লেখে প্রেমেন। গ্রামের অভিজ্ঞতা বোধ হয় কারুর তেমন নেই। দেখ, শুধু গাছ-পালার বর্ণনা, আর

—শরৎ সংখ্যা

রূপমঞ্চা—

মাঘ ১৩৪৪

দুর্গা সাতবট্টী

তাদের নাম জান্‌লেই ঠিক গ্রামকে চেনা যায় না। যারা থাকে গ্রামে, তাদের জানতে হয়। বেশী বর্ণনা থাক্‌লে সেটা কবিতার মত শোনায়। উপন্যাস আর কবিতা—এ ত এক বস্তু নয়।'

'এদের আমি দেখেছি; যারা গ্রামে থাকে, তাদের সঙ্গে মিশেছি।' 'দেখ, আমার বড় মুস্কিল। সমাজে যারা পতিত, তাঁদের কথাই বেশী লিখেছি বলেই হয়ে চলত, আমাকে অনেক সময়ে বিপদে পড়তে হয়েছে। অনেক চিঠি পত্র আসে, আমার কাছে অনেকে সাহায্য-ভিক্ষা চায়। একদিন বসে বসে বই পড়ছি। এমন হয়—অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়ি, এমন সময়ে দুয়োরে গাড়ীর শব্দ হল। একটি মেয়ে একেবারে সটাসটি আমার কাছে এসে হাজির। সে এক বিষম বিপদ। বোকালে বোঝে না। বল্‌লাম, আমি কি করতে পারি? তোমাদের কথা লিখেছি বলেই কি আমি চোরদায়ে ধরা পড়েছি? উপায় নেই—কিছু সাহায্য করতেই হয়।'

সমাজতত্ত্ব বেশ ভালো লাগে। অনেক বই পড়ি—অনেক রাত পর্য্যন্ত। তোমরা কবি, ঠিক মানুষ চেনো না। মানুষ চিনতে শেখো। তোমার বই পড়েছি। কবিতাই আমি পড়ি। উপন্যাস বা অন্য বই তেমন পড়ি না। কবিতা পড়তেই ভাল লাগে।'

তারপর রবিবাবুর দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'সুধী ঠাকুরের বাড়ীতে ছাদে আমাদের এক আড্ডা ছিল। সেখানে অনেক আলোচনা, অনেক ব্যাপার হত। দেখ, শরৎ সন্ধ্যা—

এখানে আমার ভালো লাগে না। বাড়ী যেতে পার্‌লে বাঁচি।'

এই পর্য্যন্ত মনে আছে। তারপর আমরা বিদায় নিলাম। তারপর 'রবি-বাসরে'র এক অধিবেশনে শরৎবাবুর বাড়ী যাই। সেদিন খুব খাওয়ার ধুম। সেদিন শরৎবাবুর নূতন গৃহ-প্রবেশের উৎসব ছিল। সেদিনকার শরৎবাবুর সেই সদাহাস্যময় প্রসন্ন মুখ মনে পড়ে। তাঁর সেদিনকার হাস্যকৌতুকে উজ্জ্বল কথাবার্ত্তা, আদর আপ্যায়ন সমস্তই ছবির মতন মনে আসে। আমরা উপরে খেতে বসেছি, পাতে লুচি নেই। শরৎচন্দ্র যে কোথায় অন্তর্ধান করলেন, খুঁজে পাওয়া গেল না। অনেক-ক্ষণ পরে লুচি এলে তিনি দেখা দিলেন, হেসে বল্‌লেন, 'যখনি শুনেছি লুচি নেই, তখনি পালিয়েছি, লুচি এসেছে শুনে আবার এলাম।'

তারপর, মাঝে মাঝে 'রসচক্র সাহিত্য-সংসদে' গেলে তাঁর দেখা পাওয়া যেত; শিল্পী সতীশ সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে সুন্দর একটি ঘরে পাতা গালিচার উপরে তিনি এসে বসতেন; আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসতাম। তিনি ব'সে ব'সে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের 'রচনাদর্শ' পড়তেন, প্রশংসা করতেন। ভাবাতত্ত্বের অনেক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হ'ত। মাঝেমাঝে আমাদের হাসাবার জন্য তিনি ছোট খাট গল্প বলতেন,—গ্রামের সব ছেলেমেয়েদের হাসির গল্প। একদিনের কথা মনে আছে। সে সময়ে তিনি 'দত্তা' বইখানি নাটকা-

—রূপনন্দা

বারে জল দেবার জন্য যান। একটু বেশী রাত হ'ল। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে গল্প করতে করতে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম। পথে যেতে যেতে শীতের রাতে তিনি র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে গুণ গুণ ক'রে গান গাইতে গাইতে চললেন। কীর্ত্তনের সুর—গানের ভঙ্গীরণ শুনে মনে হ'ল, তিনি বেশ সুকণ্ঠ। গুণ গুণ ক'রে গান করেন আর মাঝে মাঝে এক আধটু কথা বলেন। সেদিন বললেন, 'নাটক ত লিখছি কালিদাস, কিন্তু অভিনয় করবে কে? কারুর চেহারা আমার মনোমত নয়। নরেন-ই বা হবে কে? আর বিজয়াই বা কে হ'বে?

বছরখানেক আগে তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হ'য়েছে। তখন আমার শরীর অসুস্থ। 'রসচক্রে'র বনভোজনের কথা তিনি বলছিলেন। সেই শেষ কথা, এবং শেষ দেখা।

যাঁর কথা এতক্ষণ বললাম, এই মানুষটিকে আর দেখা যাবে না। তিনি আর নেই, একথা ভাবলেই মনটি বিষণ্ণ হয়। সাহিত্য-কীর্ত্তি তাঁর যথেষ্ট আলোচিত, সে কীর্ত্তি অসামান্য নিঃসন্দেহ, কিন্তু মানুষ হিসেবেও তাঁর অসামান্যতা ছিল। আমি যেটুকু তাঁকে দেখেছি, ঠিক সেইটুকু বললাম। তাঁর স্বর্গগত আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গতানুগতিক আমাদের জীবন প্রবাহ; তার মধ্যে গতানুগতিক বা একঘেয়ে শোকোচ্ছ্বাস লিখতে মন একেবারেই সরে না। শোকের বা বিচ্ছেদের গভীরতারও কোনো বিশেষ মূল্য নেই। তিনি চান প্রজ্ঞাবান মানুষের মনে যেন তাঁর স্মৃতি থাকে। কালপ্রবাহে জাতির দিক্ থেকে আমাদের পূজনীয় চিরস্মরণীয় যাঁরা হয়েছিলেন—তাঁদেরই একজন হয়ে রইলেন শরৎচন্দ্র। জীবন গঙ্গায় তিনি তাঁর শেষ দান সেরে আমাদের সমুখ থেকে অদৃশ্য হলেন। তাঁর শূন্য আসনের দিকে চেয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

সম্মুখের প্রজ্বলিত চিতার পানে চাহিয়া সহসা তাহার মনের মধ্যে সেই চিরদিনের পুরানো প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল—কাল যে ছিল, আজ সে নাই; আজিও যে ছিল তাহারও এ নশ্বর দেহটা ধীরে ধীরে ভস্মসাৎ হইতেছে। আর তাহাকে চিনাই যায় না; অথচ এ দেহটাকে আশ্রয় করিয়া কত আশা কত আকাঙ্খা, কত ভয় কত ভাবনাই না ছিল! কোথায় গেল? এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল? তবে কি তার দাম? মরিতেই বা কতক্ষণ লাগে?—অরক্ষণীয়া

রূপনন্দা—
মাঘ ১৩৪৪

—শরৎ সংখ্যা
দুশ উনসত্তর

শরৎসাহিত্য ও একাদশী বৈরাগী

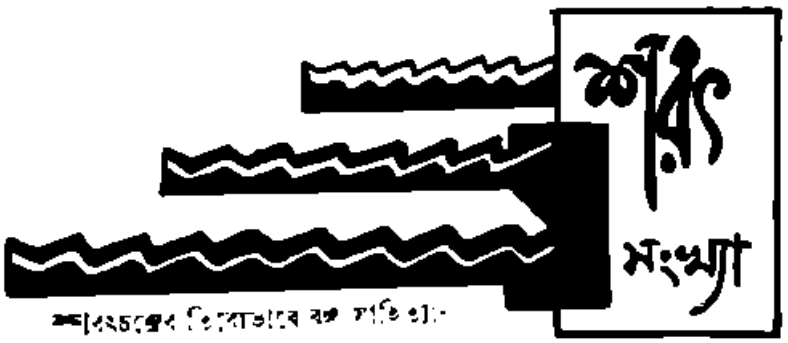

শরৎচন্দ্রের তিরোভাবে বঙ্গ সাহিত্যাকাশের এক প্রধান জ্যোতিষ্ক তিরোহিত হইল। আর তাঁর লেখনী বাংলা সাহিত্যকে নূতন সৃষ্টি দ্বারা সমৃদ্ধ করিবে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তাঁর যে দান তাহা অক্ষয় হইয়া থাকিবে—'গৌড়জন যাহে মধুপান করে নিরবধি'। এখনও হয়ত ঠিক সময় আসে নাই তাঁহার দানের পরিমাণ ও মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার। অনেক মনীষীই শরৎচন্দ্রের রচনা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তাহার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা তাঁহার জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হইয়াছে। কালক্রমে অনেকেই এই মহনীয় কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা, বিজ্ঞানের অনুশীলন, তর্কশাস্ত্রের অভ্যাস ও প্রয়োগশিক্ষার দ্বারা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে সদা মানবসমাজ আত্মনিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছে এবং সে চেষ্টার অবসান কখনও হইবে না। এইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি ও আলোচনার দ্বারা জাতিবিশেষ ও সাধারণ মানবসমাজ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। মানবের অন্তরাত্মা বাহিরের শত আবরণ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্নিগুঢ় স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারিয়াছে এই সাহিত্য সাধনার মধ্যে। শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই বিষয়ে—তিনি সমাজের নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত স্তরের নরনারীর মধ্য হইতে তাঁহার আখ্যানভাগের নায়ক-নায়িকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনা হইতে তাহাদের সুখ ও দুঃখ, আশা ও বেদনা শক্তি ও দুর্ব্বলতার সহিত আমরা নিবিড় পরিচয় স্থাপন করিতে পারি। কেবল তাহা নহে, তাহাদের সহিত আমাদের নিবিড় আত্মীয়তা ও ঐকান্ত্যও আমাদের অজ্ঞাতসারেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহার দ্বারাই আমাদের আত্মীয়তার পরিধি বাড়িয়া যাইতেছে। প্রাচীন যুগের কোন কবি এই দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই কিংবা এই স্তরের সহিত তাঁহার পরিচয়ও খুব ক্ষীণ এবং অতি বহিরঙ্গ স্থানীয়। শরৎচন্দ্রের রচনার দ্বারা কেবল

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

যে এই অপাংক্তেয় ও অবজ্ঞাত স্তরের যবনিকা উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা নহে। ইহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা উচ্চ শ্রেণীর সহৃদয় পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের মর্মস্থানে আঘাত দিয়াছে। সমাজের বিধি নিষেধের দ্বারা যাহাদিগকে সমাজের নিম্নস্তরে বা বাহিরে আশ্রয় লইতে বাধ্য করা হইয়াছে, তাহাদেরও যে প্রাণ আছে, বেদনা ও অনুভূতি আছে, হৃদয় আছে, শরৎচন্দ্রের অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী তাহা আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সমাজের প্রধান পুরুষগণ এবং এমন কি যাঁহারা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী তাঁহারাও সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে ভীত হইয়া থাকেন; তাহা ছাড়া প্রতিবিধানে করিবার উপায় আবিষ্কার করাও কঠিন। আমাদের সমাজে নিয়তই দেখা যাইতেছে যে, যাহারা সামাজিক দুর্বলতার দরুণ কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহারা যখন নিজের ভুল বুঝিয়া ফিরিয়া আসিতে চায়, তখন আমরা তাহাদিগকে সমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না। ইহা কতদূর সমীচীন জানি না, কিন্তু ইহাদিগকে অবজ্ঞা ও ঘৃণাভরে দূরে ঠেলিয়া রাখাও যে সমীচীন এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয় ইহাও হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে উপলব্ধি করি।

অনেকে সত্য সত্যই শরৎবাবুকে ভয় করেন—তাঁহার গ্রন্থ সমূহকে দূরে রাখিতে প্রয়াস পান। তাঁহাদের ভয় ও আশঙ্কার কারণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। শরৎবাবু তাঁহার প্রতিভা ও দরদীহৃদয়ের দ্বারা যে কাহিনী অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা এত বাস্তব ও সত্য, এত করুণ ও হৃদয়স্পর্শী যে তাহা পাঠ করিলে পাঠকের চিত্ত রসাপ্লুত হইয়া উঠে। এবং সমাজের এই স্তরের প্রতি বেদনাতুর করুণা উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। ইহাকে অন্ততঃ অবজ্ঞা করা কঠিন হইয়া পড়ে এবং এবিষয়ে চক্ষু মুদ্রিত করাও যায় না। শরৎবাবুর লেখনী সংযত, ভাষা মার্জিত, রীতি অনবদ্য এবং সর্বোপরি তাঁহার রসসৃষ্টির শক্তি অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। এই জন্যই যে কাহিনী তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যে কেবল আমাদিগের হৃদয়ের অভ্যন্তরে দাগ রাখিয়া যায় তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে একটা বিপর্য্যয় ও বিপ্লব ঘটাইয়া দেয়। ইহা তো অল্প শক্তিশালী লেখকের কার্য্য নহে। শরৎবাবুর অনস্বীকার্য্য প্রতিভার দ্বারাই ইহা সাধিত হইয়াছে এবং ইহা এত প্রবল, এত দুর্দ্ধমনীয় ও অনিবার্য্য যে ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। কোন সমাজ সংস্কারকের যুক্তিপূর্ণ ও ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা ইহা সাধিত হয় না—কারণ তাহাকে প্রতিকূল যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। কিন্তু শরৎচন্দ্রও তর্ক করেন নাই—কেবল যুক্তির উপর তিনি তো নির্ভর করেন নাই —তিনি তো আমাদের বুদ্ধিকে

স্বপ্নলব্ধা—

—শরৎ সংখ্যা

মাঘ ১৩৪৯

দুশ একাত্তর

আঘাত দেন নাই—তিনি আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং মনস্তত্ত্ববিশারদের ন্যায় আমাদের বেদনা ও অনুভব-শক্তিকে অন্তর্মুখী করিয়া দিয়াছেন। কেবল যুক্তিকে মানুষ ভয় করে না, সাধারণ মানব যুক্তির ধারও কম ধারে। পণ্ডিতগণ সাধারণ ব্যবহারে যুক্তির নির্দেশমত চলিতে পারেন না—অন্ততঃ ভুলিয়া যান। কিন্তু হৃদয়ের আবেগ, অজ্ঞাতপ্রবণতা ও ভাব প্রেরণাই আমাদের কর্মশক্তির মূল উৎস। শিক্ষার দ্বারা, যুক্তি ও তর্ক-বিচার অনুশীলনের দ্বারা ইহা সংযত ও পরিশোধিত হইয়া যায় কিন্তু এই ভাব-প্রবণতা ও বেদনাই মানুষের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দান করে। পশুর ভাবপ্রবণতা নাই, দেবতারও নাই, মানুষের ইহা বিশিষ্ট অধিকার। মানুষই রসবোধে সমর্থ, মানবের চিত্তেই রসসৃষ্টি হয় এবং চিত্ত হইতে চিত্তান্তরে সঞ্চারিত হয়। কবি রসসৃষ্টি করেন বলিয়া ভিতরের মানুষটিকে বশে আনেন এবং হয়তো অনেকখানি বদলাইয়া দেন। যুক্তির দ্বারা যাহা পরোক্ষভাবে এবং উদাসীনভাবে সত্য বলিয়া মনে করি তাহা যতক্ষণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে রসবোধের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত না হয়—ততক্ষণ তাহা বাহিরের বস্তুই থাকে। কবি আমাদিগকে রসবোধে প্রবুদ্ধ করেন, তাঁহার সৃষ্ট নর-নারীকে আমাদের পরম আত্মীয় করিয়া দেন। তাহাদের সুখ দুঃখ, দৈন্য ও দুর্বলতা আমরা দরদের সঙ্গে দেখি এবং অজ্ঞাতসারে আমাদের একান্ত আপনার

মহৎ সংখ্যা—

দুঃখ বাহাদুর

বলিয়া বোধ করি। তার্কিকের যৌক্তিক দৃষ্টিতে ইহাকে যারা বা বিভ্রম বলিয়া মনে করিয়া বর্জনা করিতে হইবে বটে —কিন্তু ইহা রসিকের নিকট বিভ্রম নহে। বরং মানুষের সহিত মানুষের যে ভেদ তাহা সমাজ, কৌলীন্য, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রভৃতি বাহ্য কারণপ্রসূত, কিন্তু দার্শনিক ও তত্ত্বদর্শী এই ভেদকে আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক বলিয়া মনে করেন না। তত্ত্বদৃষ্টিতে ও রসদৃষ্টিতে এই ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া কবির সৃষ্ট নরনারীকে আমরা আত্মীয় মনে করি না—বরং তাদের সত্তায় আমাদের সত্তা বিলিয়া যায়। অ্যারিস্টটল যাহাকে Katharsis বলিয়াছেন, তাহার অর্থ চিত্ত বিশোধন। কিন্তু এই চিত্তবিশোধন বা Katharsis সম্ভব হয়—ঐকাত্ম্যবোধের দ্বারা।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির স্বরূপ ও মূল্য নির্ধারণ করা মোটেই সহজ হইবে না। কারণ তৎপূর্বে শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক গ্রন্থের বিশ্লেষণ ও আলোচনা এবং তাহার সৃষ্টির ধারা ও ক্রমপরিণতির পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। আর সহৃদয়তা প্রেক্ষাশক্তি এবং মার্মিকতা ইহাদের কোনটিই জগতে সুলভ নহে। কবির জীবিতকালে অনেকে তাহার স্তুতি ও নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তুতি ও নিন্দা যতক্ষণ অন্ধ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, ততক্ষণ তাহার কোন স্থায়ী মূল্য হইতে পারে না। ইহার জন্য চাই বিচক্ষণ অন্বয়ী। এই অন্বয়ীর স্থান আবিষ্কার করিবার শক্তি

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪

বা অবসর বর্তমান গ্রন্থে লেখকের নাই। তাহা ছাড়া, একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে এই বহায়াসসাধ্য পরিকল্পনাও সম্পাদিত হইতে পারে না। তবে একটি ক্ষুদ্র লেখাকে অবলম্বন করিয়া দিগ্‌দর্শন করিতে প্রয়াস করিব। 'একাদশী বৈরাগী' শরৎচন্দ্রের অতি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ এবং রচনা হিসাবে শরৎসাহিত্যের মধ্যে ইহার স্থান খুব বড় না হইতেও পারে। কিন্তু এই ক্ষুদ্রায়তন আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই—বহু ঘটনার ও বহু ব্যক্তির সমাবেশ। অতি সামান্য ইহার কথা-বস্তু। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের বৈচিত্র্য ও বৈলক্ষণ্য সুস্পষ্ট, কাহারও ব্যক্তিত্ব ম্লান হয় নাই। কয়েকটি শব্দের দ্বারাই এক এক জনের চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। সবচেয়ে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে দুইটি চরিত্র—একটি একাদশী বৈরাগীর ও দ্বিতীয়টি তাহার সৌরীর। সৌরী সম্বন্ধে গ্রন্থকার দুই একটি মাত্র কথা বলিয়াছেন—কিন্তু তাহাতে যে নারী মূর্তি প্রকটিত হইয়াছে তাহা স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাঁহার খুঁটি-নাটির উপর অধিকার (Command over details)। কোথাও কোন আবছায়া বা কুয়াসার আবরণ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের চরিত্রের গভীরতার কোন ক্ষতি হয় নাই। সৌরী "বয়স ও বুদ্ধির দোষে" প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেল। একাদশী অনেক দুঃখে, অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। "গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথার

—শরৎ সংখ্যা,
মাঘ ১৩৩৯

তুলিয়া লইয়া তাহার এই লাঞ্ছিতা, একান্ত অনুতপ্তা দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে গৃহের বাহির করিয়া আবার জাতে উঠিতে অনুশাসন একাদশী কোন মতেই রাজী হইতে পারিল না। গ্রামে তাহার নাপিত-বন্ধ হইয়া গেল—"একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া বারইপুরে পলাইয়া আসিল।" উচ্চ শিক্ষিত যুবক অপূর্ব তাহার সঙ্গীদিগকে লইয়া গ্রামের হাইস্কুলের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া যখন এই একাদশী বৈরাগীর বাড়ীতে হানা দিল এবং চাঁদা আদায়ের জন্য কুসীদজীবী "টাকার কুমীর" একাদশীর নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, তখন তাহাদের মধ্যে বচসাবচির বিবরণ এবং একাদশীর চার আনার বেশী চাঁদা দিতে অস্বীকার ও কাতরোক্তি উপভোগের বিষয়। সেই প্রসঙ্গে একাদশীর ভগিনী সৌরীর চরিত্রের উপর তাহারই সম্মুখে নিদারুণ ও নির্লজ্জ আক্রমণ বড়ই বেদনা দেয়। সৌরীর বর্তমান অপরাধ যে অপূর্বর আহারে স্বয়ং তাহার জন্য এক গেলাস জল ও রেকাবীতে বাতাসা আনিয়াছিল, এই আঘাতে যখন তাহার হাত হইতে রেকাবিটি বনাৎ করিয়া পড়িয়া গেল, তখন তাহার অসীম লজ্জার মৃত চোখে পড়িয়া 'অপূর্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল।'

কিন্তু এটা সৌরীর চরিত্রের একদিক। অপর দিকটা হইতেছে যখন অপূর্বর গ্রামবাসী ছেলে পুঁটে গলায় উত্তরীয়

—শরৎ সংখ্যা,
ভুল ভিরাত্তর.

দিয়া তাহার বিধবা মাতার সহিত একাদশীর গৃহে তাহার সদ্য পরলোকগত পিতামহের সঞ্চিত পাচশত টাকার জন্য আবেদন করিতে উপস্থিত হইল এবং যখন তাহার কোন হাতচিঠা বা সাক্ষী প্রমাণ অভাবের কথা স্পষ্ট স্বীকার করিল এবং একাদশীর কর্মচারী ত্রিসন্ধ্যাকারী সদ্ব্রাহ্মণ ঘোষালমহাশয় তাহাদিগকে সংক্ষেপে বিদায় করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, তখন এই অপরাধিনী নারী হিসাবের খাতা দেখিবার জন্য দরিদ্র ও অসহায় ব্রাহ্মণ-বিধবা ও অসহায় ব্রাহ্মণকুমারের জন্য যে ব্যগ্রতা দেখাইল, তাহা সত্যই প্রাণস্পর্শী। যখন হিসাবে সুদে ও আসলে তাহার ৭৪০৲ টাকা প্রাপ্য স্থির হইল এবং ঘোষালের সহৃদয়তায় যে আসল মুক্তো-জোড়ার কথা চাপা পড়িয়াছিল, তাহা কুসীদজীবী কৃপণশিরোমণি ক্ষুদ্রচেতা একাদশী বৈরাগী নিজে আবিষ্কার করিয়া তাহা সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিল, তখন ভ্রাতা ও ভগিনীর চরিত্রের অপর দিকটা প্রকাশিত হইল। তাহা বুঝিল কেবল অপূর্ব—বুঝিল কেবল তাহা নহে,—ইহা তাহার সদ্যোজাত ব্রাহ্মণ্যাভিমানের উপর আঘাত করিল এবং তাহাতে ব্রাহ্মণ্য ও মনুষ্যত্বের বিরোধ ঘটাইয়া দিল। পরিশেষে অপূর্বকে গৌরী হস্তস্পৃষ্ট জলের দ্বারা পিপাসা নিবৃত্তি করিতে ফিরিয়া আসিতে হইল। অপূর্বর চিত্তে যে সংগ্রাম উঠিয়াছিল তাহা তাহার একার নহে, তাহা সমস্ত দরদী ব্যক্তি মাত্রের। গৌরীও একটিমাত্র নারী নহে। তাহার অবোধকৃত পদস্খলনের যে দীর্ঘকালব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যা তাহাও একমাত্র তাহারই নহে। গৌরী সমস্ত ত্রাস্ত ও প্রতাড়িত নারী-সমাজের প্রতীক এবং অপূর্ব সমস্ত দরদী সহৃদয় মানুষের প্রতিনিধি। ইহা বারংবার জানাইয়া দিতেছে যে, বোধ হয় আমাদের সামাজিক শাসনের উগ্রতা মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে—অনেক সময় আমাদের চিন্তা ও সহৃদয় অনুভবের অবসরের অভাবে। ইহাকে অভিনন্দন করিতে না পারি, অসম্মান করা যে বড় নিষ্ঠুরতা তা বুঝিতে পারা যায় এবং মধ্যে এক ব্যথা ও বেদনা অনুভব করিতে হয়।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

বয়সের সম্মান জ্ঞানটা যেমন পুরুষদের মধ্যে আছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তেমন নয়। পুরুষের মধ্যে অনেকগুলি পর্য্যায় আছে;—।···ত্রিশ-বর্ষীয় একজন বিংশবর্ষীয় একজন যুবার প্রতি বেশ মুরুব্বিয়ানা ধরণে চাহিয়া দেখিতে পারে, কিন্তু মেয়েমহলে এটা খাটে না।···ষোল হইতে ছাপ্পান্ন পর্য্যন্ত তাহারা সমবয়সী।—চন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্রের স্মৃতি

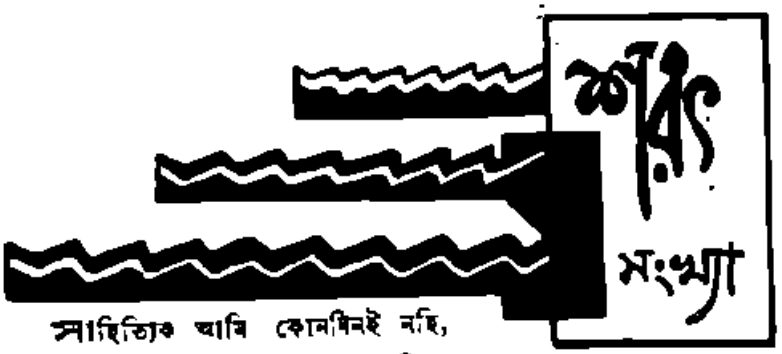

সাহিত্যিক আমি কোনদিনই নহি, একেবারে সাধারণ সাংসারিক জীবন আমার; তাই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার সাহসও আমার নেই। শুধু তাই নয়, মানুষ যখন বিশেষ করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ে তখন কিছুই বলিবার শক্তি তাহার থাকে না।

প্রায় তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অতি আকস্মিকভাবে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার পরিচয়ের সামান্য সুযোগ হইয়াছিল; সেই কথাটাই আজ আমার বলিবার বিষয়।

ইংরেজী ১৯১৫ সালের কথা। ঠিক মনে নাই কি একটা কাজের জন্য মধুপুরে গিয়াছিলাম। মধুপুরের পার্শ্বরোড রাজ-ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মতিলাল মিত্র মহাশয়ের সাথে পরিচয় হইল। মধুপুরে দেবার মতিবাবুর অতিথি হইয়াছিলাম। একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, ফিরিয়া দেখি ক্ষীণ দেহ এক ভদ্রলোক মতিবাবুর সাথে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। তাঁর বেশ বিন্যাসের পরিপাটি নাই, মুখখানি গোঁফ ও দাড়িতে ভর্ত্তি বলিয়া রূপনন্দা—

মাঘ ১৩৪৪

ভালভাবে দেখা যায় না; একটি পাঞ্জাবী তার উপর একখানি চাদর জড়ানো। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো কিছুই তাঁর ছিল না। মতিবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কালী, ইনি চন্দ্রেন শরৎবাবু, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক, বহু উপন্যাস ইনি লিখেছেন…" সম্ভ্রমভরে তাঁকে নমস্কার করিতে তিনি ঈষৎ হাসিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, "আরে যত রাজ্যের কথা কেন শোনেন, আমি আবার সাহিত্যিক! ঐ সময়-না কিছু কিছু লিখি মাঝে মাঝে"…সেই সময়ও তিনি কি একখানি বই লিখিতেছিলেন, সেকথা ঠিক আমার মনে নাই। কিন্তু আমি অবাক হইয়া গেলাম তাঁহার সৌজন্য প্রকাশে। বাস্তবিকই তাঁর নাম পূর্ব্বে বইয়েতেই দেখিয়া আসিয়াছি এবং নিজেও তাহার প্রত্যেকখানি পুস্তক পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অতবড়ো লোকের মুখেও বিনয়ের কি সুন্দর অভিব্যক্তি! শুধু মহৎ ব্যক্তিরই পক্ষে তা সম্ভব।

শ্রীকালীকৃষ্ণ মিত্র

—শরৎ সংখ্যা

দুশ পঁচাত্তর

রূপনারায়ণ

প্রথম বর্ষ	মাঘ ১৩৪৪	পঞ্চম সংখ্যা

গত ৪ঠা মাঘ 'রূপনারায়ণ' কার্য্যালয়ে রূপনারায়ণ পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক শরৎচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষ্যে একটি শোকসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

"এই সভা বাংলার তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। এই সভা আরও মনে করেন যে তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে।"

শরৎচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিয়া আমরা "রূপনারায়ণ" শরৎ-সংখ্যা প্রকাশিত করিলাম। যে সকল লেখক এই সংখ্যায় প্রবন্ধ ও কবিতা দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। স্থানাভাবে কয়েকটি রচনা আমরা প্রকাশিত করিতে পারিলাম না, সেগুলি যথাসময়ে বাহির হইবে।

• • •

যুগে যুগে দেশের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটে। সাহিত্য ও তাহার আদর্শ সম্বন্ধেও একথা খাটে। শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার রচনাবলী পড়িতে পড়িতে তাঁহার সম্বন্ধে একটি সচেতন প্রশ্ন প্রায়ই আমাদের মনকে

শরৎ সংখ্যা—
পৃষ্ঠা ছিন্নাঙ্কিত

চিন্তাগ্রস্ত করিয়া তুলে। আজ শরৎচন্দ্রের দেহাবসান ঘটিয়াছে। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি ও জানিয়াছি। কিন্তু আমাদের পরবর্ত্তীযুগের লোকেরা শতবর্ষ পরে 'চরিত্রহীন' 'শ্রীকান্ত' 'দেবদাস' প্রণেতা শরৎচন্দ্রকে স্রষ্টা হিসাবে কি ভাবে কল্পনা করিবে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব Study'র মধ্য দিয়া তাহারই পূর্ব্বাভাস দিয়াছেন।

• • •

বিখ্যাত কবি শেলী ১৮২২সালে গত লোক গমন করেন। শেলী দুইজন বন্ধুকে লইয়া নৌকায় জলভ্রমণে বাহির হন এবং দুর্ঘটনায় পড়িয়া সকলেই পরে জলমগ্ন হন। সে সময়ে তিনি ও কবি লর্ড বায়রণ একত্র অবস্থান করিতেছিলেন। শেলীর এই অকালমৃত্যুতে লর্ড বায়রণ অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার সম্বন্ধে শেলীর মৃতদেহ প্রাচীন গ্রীক প্রথানুযায়ী অগ্নীভূত করা হয়। "আঃ প্রমিথিউস" ছবিখানিতে এই দৃশ্যটিই দেখান হইয়াছে।

• • •

শরৎচন্দ্র আর নাই। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের

একটি সুসম্পূর্ণ দিকেরও চিত্রশিল্পের মত অবসান হইয়া গেল। আমাদের দেশের সাহিত্যের ধারার সহিত যাঁহারা সাম্যক-রূপে পরিচিত তাঁহারাই জানেন শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণ নূতন বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন—এবং প্রথম প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লন। তখনকার দিনেও (যখন রবীন্দ্রনাথের সুচিহ্নিত উপন্যাসও বাহির হইয়াছে) অপ্রত্যাশিতরূপে সাহিত্য আকাশে আপনার প্রতিভাবলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। এই যে প্রতিষ্ঠা ইহার কারণ কি? শরৎচন্দ্রের পূর্বে গল্প ও উপন্যাসের দিক দিয়া দেশের জনসাধারণের যে ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয় নাই ইহা বলিতে পারি না। সাধারণে বঙ্কিমবাবুর ঐতিহাসিক, সামাজিক উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল। পাঠক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কয়েক খানি সুলিখিত জটিল সমস্যাপূর্ণ উপন্যাসও পাঠ করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও শরৎ-চন্দ্রের এত জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠার কারণ কি?

প্রথমতঃ শরৎচন্দ্রের অভিনব বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী। শরৎচন্দ্র-পূর্ব বঙ্গসাহিত্যে আমরা বাঙ্গালী চরিত্র পাইয়াছি—কিন্তু তাহারা যেন আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন বাঙালী জীব নহে! সে সকল চরিত্রের মূল কথা ছিল আভি-জাত্য; তাহাদের ঘটনাস্থলও ছিল অধি-কাংশ স্থলে সহর বা তদনুযায়ী আবেষ্টনীর মধ্যে। কিন্তু শরৎচন্দ্র আসিলেন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া—নূতনতর ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়া।

"Or is it some more humble lay
Familiar matter of today?
Some natural sorrow loss or pain
That has been and may be again."

কবির এই ভাবধারাকেই আশ্রয় করিয়া তিনি সম্পূর্ণ নূতন দিক দিয়া বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সারা দেশবাসীকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া দিলেন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী জনসাধারণ নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল—তাঁহার গল্পের মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালীর অতি সাধারণ সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান কলহ-কোলাহলের পরিচয় পাইয়া বাঙ্গালী তাহার সমাজের নানা প্রকার দীনতা ও অত্যাচারের প্রতীকারের পন্থা খুঁজিয়া পাইল— বাঙ্গালী আপনাদের যথার্থরূপ চিনিতে আরম্ভ করিল। শরৎচন্দ্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলিই তাঁহার অননুকরণীয় অপূর্ব ভঙ্গীতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং জনসাধারণ আকুল আগ্রহে তাহা পড়িতে আরম্ভ করিল। শরৎ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও জন-প্রিয়তার বোধ করি ইহাই প্রথম ও প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অভূতপূর্ব চিন্তাধারা তাঁহার নূতন মতবাদ ও পতিত নিপী-ড়িতের প্রতি সমবেদনা ও সেগুলি সর্ব-সমক্ষে প্রকাশ করিবার শক্তি ও সাহস।

—শরৎ সংখ্যা

নারীর সতীত্ব যে দেহেই নহে—তাহার যথার্থ স্থান যে নারীর মনে—এত বড় মত প্রকাশ করিবার মত সাহস মাত্র শরৎ-বাবুরই ছিল। শরৎচন্দ্র-পূর্ব্ব বঙ্গসাহিত্যে, পতিতার চরিত্র লইয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করা যাইতে পারে,—সাহিত্য সৃষ্টি ও দূরের কথা এ হেন চরিত্র যে সাহিত্যের পর্যায় মধ্যেই আসিতে পারে তাহা কেহ ভাবে নাই। শরৎচন্দ্র এই শ্রেণীর চরিত্র বঙ্গ-সাহিত্যে আমদানি করিয়া এক যুগান্তরের সৃষ্টি করিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোনও বিখ্যাত সাহিত্যিকের নিকট শুনিয়াছি যে 'চরিত্রহীন' এর পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন, "……এত সুন্দর ও চমৎকার …তখনকার লোভ হয় আমার কাগজে (সাহিত্য) দেবার জন্যে…আবার তার চেয়ে বেশী ভয় হয়—এ ছাপলে হয়ত আমার কাগজ উঠে যাবে।" শুধু তিনি নহেন ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও "ভারতবর্ষে" এটি ছাপাইতে রাজী হন নাই। অবশেষে এটি "যমুনা"য় প্রকাশিত হয়। ইহার পর শরৎচন্দ্র তাঁহার এই নীতি ও মতবাদ লইয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং দেশবাসী সেগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ তিনি কখনও মিথ্যা লিখেন নাই। তিনি তাঁহার উপন্যাসের মধ্যেও বলিয়াছেন—যাহা মিথ্যা, যাহা আমরা জানি না তাহা লিখিবার প্রবৃত্তি যেন আমাদের না হয়। তাই তাঁহার অধিকাংশ চরিত্র সত্য, জীবন্ত ও ঘটমান—কারণ তাহাদের পটভূমি বাস্তব ভিত্তির উপর গঠিত।

এই প্রসঙ্গে দোটাকরেক কথা না বলিলেই নয়। সকলেই জানেন যে শরৎ-চন্দ্র জীবনে কোনও দিন publicity চাহেন নাই। জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করার পরও তিনি সকলের নিকট হইতে দূরে থাকিতেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দু'একজন সাহিত্যিক (?) তাঁহাকে লইয়া ও তাঁহার সাহিত্য লইয়া যথেষ্ট হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক মহাশয় দুঃখসহকারে আমাকে বলিয়াছিলেন—"যাবার আগে দেশের লোকের ওপর তিনি কি ধারণা নিয়ে গেলেন বলত ?…এরাই আবার শিক্ষিত, —সাহিত্যিক !"

•

বেশী দিনের কথা নহে—নূতন প্রকাশিত কোনও ইংরাজী দৈনিকে জনৈক তথা-কথিত শিল্পসমালোচক ও কলাচূড়ামণি তাঁহার সম্বন্ধে যে ভাষা প্রয়োগ করিয়া-ছিলেন তাহা সত্যই অকথ্যবোধ্য। রসিক প্রবরের জানা উচিত ছিল, publicityর দ্বারা কোনও চিত্রধারা চলিতে পারে বা তাহার সস্তা আলোচনা চলিতে পারে কিন্তু সত্যকার সাহিত্য চলে না। সীমা-লঙ্ঘাহীন নিরঙ্কুশ ও নিয়মবর্জ্জিত চিত্রকলার পক্ষ লইয়া তিনি স্থানবিশেষে যতই চিৎকার করুন না কেন, দেশের লোক জানে যে তথাকথিত এই শ্রেণীর শিল্পী রাস্তার রাস্তায় মিলিতে পারে বা এই শ্রেণীর শিক্ষায়তনে তৈয়ারী হইতে পারে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত স্রষ্টা দেশে ক্বচিৎ জন্মগ্রহণ করেন। "Geniuses are born, they are never made"

—রূপনন্দা

মাঘ ১৩৪৪